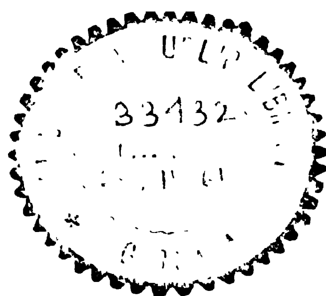
॥ বাংলার লোক-শ্রুতি ॥

বাংলার লোক-শ্রুতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

এম.এ., পি-এইচ্-ডি



কলিকাতা

পুরোগামী প্রকাশনী

১৯৬০

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশক

সুকুমার চৌধুরী

পুরোগামী প্রকাশনী

১০০/১, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ,

কলিকাতা-৪

মুদ্রক

মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

টেম্পল প্রেস

২, ন্যায়রত্ন লেন,

কলিকাতা-৪

মূল্য পাঁচ টাকা

ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত

এম.এ., পি-এইচ্. ডি

মহোদয় করকমলেষু।

'দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য, তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বে যখন আমার 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন হইতেই গতানুগতিক ক্ষেত্রগুলির বাহিরেও মঙ্গলকাব্য কীর্তিত লৌকিক দেবদেবীদিগের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছিলাম। কারণ, এ' কথা সেদিন অতি সহজেই বুঝিয়াছিলাম যে, গতানুগতিক পথে এই বিষয়ক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না—রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ ইহাদের সম্পর্কে কিছুই লিখিয়া রাখিতে পারে নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে ইহার উপকরণ সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। তাহার পর হইতে এই বিষয়ে নানা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাহার ফলে দেখিতে পাইলাম, পুঁথিপাঠ্য বিষয় ছাড়াও কেবলমাত্র চোখে দেখিয়াও এত শিক্ষার বিষয় আমাদের হাতের চারিপাশ হইতেই আমরা উদ্ধার করিতে পারি যে, তাহাদের সদ্ব্যবহার করিযাই আমাদের বহু বিষয় সম্পর্কেই অজ্ঞতা দূর হইয়া যাইতে পারে। বাংলা দেশ, বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের বহু তথ্য পুঁথির পাতা ছাড়াও মাঠে, ঘাটে, বৃক্ষমূলে, জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপে, এদেশের নরনারীর স্মৃতি ও শ্রুতিতে এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে, কেবলমাত্র সহানুভূতি ও অধ্যবসায় দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা দ্বারাই বাঙ্গালী জীবনের যে ইতিহাস রচিত হইতে পারে, তাহা আজ পর্য্যন্তও সম্ভব হয় নাই। আমাদের চিরদিনের অভ্যাসই এই যে আমরা হাতের কাছের জিনিষকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বহু দূরের জিনিসের দিকে হাত বাড়াইয়া আছি। ফলে আমরা কাছের জিনিস যেমন পাই না, দূরের জিনিসকেও আয়ত্ত করিতে পারি না। এই সকল উপকরণ সংগ্রহ ও অনুশীলন করিবার একটি সমাজ-বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশে জ্ঞান খুব স্পষ্ট নহে। আমি যথাসম্ভব

সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি : সেইজন্য ইহা বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব সংযোজনা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশের বিষয় যত অভিনব হউক, আমি বিশ্বাস করি, বাঙ্গালী মাত্রেরই তাহা আদরণীয় হইবে। বাংলা দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি এ পর্যন্ত বহু তুচ্ছ কথা বাঙ্গালী পাঠককে শুনাইয়াছি, তাহা কিছুই উপেক্ষিত হয় নাই।

লোক-শ্রুতি বলিতে আমি ইংরাজি Folklore কথাটিই বুঝিয়াছি ; তবে Folklore কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, এখানে আমি তাহা সীমায়িত করিয়া বাংলার লৌকিক ধর্ম ও লোকাচারকেই বুঝাইতে চাহিয়াছি। প্রত্যেক সমাজেই শাস্ত্রের দুইটি রূপ দেখা যায়—প্রথমতঃ লিখিত রূপ, তাহাকে ইংরাজীতে Scripture বলা যায় ; কিন্তু ইহার আর একটি রূপ আছে, তাহা অলিখিত—ইহা সমাজের কেবলমাত্র শ্রুতি আশ্রয় করিযাই প্রচলিত থাকে। আমরা যাহাকে নিরক্ষর সমাজ বলি, তাহার মধ্যে ইহার বিকাশ ও প্রচার হয। বৃহত্তর সমাজে লিখিত শাস্ত্র অপেক্ষা অলিখিত শ্রুতির শক্তি অধিক। এই গ্রন্থে বাংলার পল্লীতে প্রচলিত যে সকল পূজাপার্বণ, উৎসব ও সমাজ ব্যবস্থার বৃত্তান্ত দেওয়া গেল, তাহা সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য নানাদিকে স্পর্শ করিয়াছে, বিশেষতঃ ইহাদের মধ্য দিযাই বৃহত্তর বাঙ্গালীর সমাজ জীবনের পরিচয প্রকাশ পাইয়াছে। মুষ্টিমেয অভিজাত পরিবারের পরিচয়ই বাঙ্গালীর পরিচয় নয, বরং বৃহত্তর সমাজের অন্তর্ভুক্ত অগণিত নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয়ের মধ্যেই সামগ্রিক জাতির পরিচয় প্রকাশ পায়। ইহার মধ্যে তাহারই কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামকে ভিত্তি করিয়াই আমি এই আলোচনা করিয়াছি ; ইহার, কারণ এখনও ঐ অঞ্চলে প্রাচীনতম গ্রামীণ সমাজ ব্যবহার কিছু কিছু পরিচয় অবশিষ্ট আছে—মুসলমান ধর্ম প্রচারের ফলে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে তাহা ইতিমধ্যেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনা হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মঙ্গল কাব্যে যে দেবতাদিগের মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে, তাহা কেহই দেবভাষা আশ্রয় করিয়া পুরাণের ভিতর দিয়া আসিয়া বাংলার মানসভূমিতে অবতীর্ণ করেন নাই ; এক আদিম ধর্মবিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া বাংলার মাটির উপরই ইহাদের জন্ম

হইয়াছে। মানুষের ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারায় এই আলোচনার যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই গ্রন্থের বিষয় যখন ধারাবাহিকভাবে অধুনা লুপ্ত 'গাঙ্গেয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই ইহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের দৃষ্টি কিছু কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে আমার বিষয়বস্তু তাহাতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তখন ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য অনেকেই অনুরোধ করেন। কারণ, বাংলার পল্লীজীবন নানা কারণে আজ দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। যে সকল বিবরণ এই গ্রন্থে আমি দশ বৎসর পূর্বে প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছি, আজ তাহাদেরও অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট শীঘ্রই লুপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। আজ পল্লী 'উন্নয়নে'র গুরুত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্র বিশেষভাবে সচেতন হইয়াছে। কিন্তু সেই 'উন্নয়নে'র নামে পল্লীর মৌলিক বিশেষত্ব যদি বিসর্জিত হয়, তবে তাহা কল্যাণ কর হইবে না; সুতরাং সেই বিশেষত্ব টুকু বুঝিবার সহায়ক হইবে বলিয়া গ্রন্থখানির একটি সময়োচিত মূল্য প্রকাশ পাইবার যোগ্যতা আছে। পুরোগামী প্রকাশনী ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন, তাহার ফলেই বর্তমান আকারে গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হইল।

এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহকালে যে সকল পল্লীবাসী আমাকে আতিথ্য দান করিয়া আমার কার্যের সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদিগকে এই সুযোগে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রতি যদি কাহারও বিন্দুমাত্রও কৌতূহল জাগাইয়া তুলিতে পারে, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিব।

'ভট্টাচার্য ভবন'
৩২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড
কলিকাতা-৩৪

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বিষয়-সূচী

ভূমিকা

লোক-সংস্কৃতি

লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক কৌতূহল আমাদের দেশে খুব অল্প দিন হইল সৃষ্টি হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে জন-সাধারণের জীবন সম্পর্কে জানিবার যে প্রেরণা দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেই লোক-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগেরও সৃষ্টি হইযাছে। কিন্তু সেই অনুরাগ একটি সুস্পষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিযা আজও প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায় নাই। জনসাধারণের বিষয়ে আমাদের এই নবজাগ্রত কৌতূহলকে সুস্পষ্ট প্রণালীবদ্ধ রূপে প্রকাশ করা বর্তমানে একান্ত প্রযোজন। সমাজ-জীবন একটি সুসঙ্গত নিয়ম অনুসরণ করিয়া বিকাশ লাভ করে, সেই নিয়মের পথেই ইহার সাংস্কৃতিক রূপের পরিচয়টিও প্রকাশ পায়। সমাজ-বিজ্ঞান তথা লোক-সংস্কৃতির যাঁহারা গবেষক, তাঁহারা সমাজ-জীবনের আত্মবিকাশের সেই ধারাটির সন্ধান দিয়া তাহা প্রকাশ করিবার একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিযা থাকেন। আমাদিগকে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ক কোন নির্দেশ ইতিপূর্বে এদেশে যদি পাওয়া যাইত, তবে আজ আমাদের এই দায়িত্বটি এত কঠিন হইত না। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের সুনির্দিষ্ট একটি প্রণালী এঁদেশেও স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে এখনও সে রকম কিছুই স্থির হয় নাই।

মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি যখন ব্যাপকভাবে দেশ দেশান্তরে ভাগ্যান্বেষণের জন্য বাহির হইয়া পড়ে, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির লোক ও তাহাদের বিচিত্র আচার-আচরণ দেখিয়া মানব-জাতি সম্পর্কে জানিবার তাহাদের কৌতূহল সৃষ্টি হয়। ইহার ফলেই পাশ্চাত্য জগতে নৃবিদ্যা (anthropology) নামক একটি নূতন বিদ্যার জন্ম হয়। সর্ব প্রথম যখন এই বিদ্যার জন্ম হয়, তখন মানবের বহিরঙ্গগত পরিচয়ই ইহার লক্ষ্য ছিল, তাহার নাম Physical anthropology বা শারীর নৃবিদ্যা। মানবের প্রকৃতি অপেক্ষা আকৃতিই ইহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া উহা কোন চরম সত্যের নির্দেশ দিতে পারে নাই; কারণ, মানুষের আকৃতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল, জলবায়ু

ও শীতাতপ-নিযন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ একই জাতি বিশেষ এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষ দৈহিক আকার লাভ করে। যখন কোনও কারণে সেই পরিবেশ হইতে ইহার স্থানচ্যুতি ঘটে, তখন নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন রূপ গ্রহণ করিতে তাহার বিলম্ব হয না। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, অষ্ট্রেলিযার খর্ববপু কৃষ্ণকায আদিম জাতি ইউরোপীয দীর্ঘাকৃতি শ্বেতকায জাতিরই বংশধর। অথচ আজ ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিযা এ'কথা কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিযা পাশ্চাত্ত্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ কেবলই নরকঙ্কালেব দৈর্ঘ্যপ্রস্থ লইযা আলোচনা করিযাছেন; দেশ দেশান্তরের সজীব মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন উপেক্ষা করিযা ইহাব প্রাণহীন কঙ্কালেব মধ্যে তাহাদেব দৃষ্টি ও জ্ঞান সীমাবদ্ধ বাখিবার প্রযাস পাইযাছিলেন। ইংবেজি শিক্ষা প্রবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ'দেশে যে ইংবেজি জ্ঞানে দীক্ষা লাভ করিযাছিলাম, তাহা সর্বতোভাবেই আমাদিগকে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার দাসত্বে পরিণত কবিযাছিল। ভাবত যদিও বহুকাল হইতেই বহু জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত দেশ—যদিও আমাদেরই প্রতিবেশী-রূপে বহু বিচিত্র জাতি আদিম কাল হইতেই বাস কবিযা আসিতেছে, তথাপি আমরা তাহাদেব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পবিত্যাগ কবিযা এই বিষযক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানানুশীলনেব ভ্রান্ত পথটিই অনুসরণ কবিযাছি—আমাদের দেশেব নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও তাহাবই অনুকরণে কঙ্কালেব সাধনায প্রবৃত্ত হইযা-ছিলেন। কিন্তু এই অর্থহীন কঙ্কালের সাধনা আমাদের দেশে যেমন ব্যাপক অনু-শীলনেব বিষয হইতে পারে নাই, তেমনই শিক্ষিত জনসাধাবণেব কোন উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পাবে নাই। আজ পাশ্চাত্ত্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও কঙ্কাল-সাধনাব অন্তঃসাবশূন্যতা উপলব্ধি করিযা সমাজ-জীবনেব ক্রমবিকাশের ধারা অনুশীলন করিবার নূতন নূতন পথ উদ্ভাবন কবিতেছেন; ভাবতবর্ষে ইহার অনুশীলন এখনও খুব ব্যাপক না হইলেও একেবারে যে এখনও সূত্রপাত হয নাই, তাহা নহে। অথচ ভারতবর্ষের মত দেশেব পক্ষে এই বিষয অনুশীলন যত সহজসাধ্য, অন্য কোন দেশের পক্ষে তাহা তত সহজ সাধ্য নহে। ভাবতের কোন কোন অঞ্চলে এখনও আদিম সমাজ-ব্যবস্থা যেমন দেখিতে পাওযা যায, তেমনই আধুনিকতম সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গেও পরিচয লাভ করা যায়। উড়িষ্যার

ভূমিকা

কোরাপুট জিলার পার্‌লাকামিডি সহরে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজ অনুযায়ী নাগরিক জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় ; কিন্তু তাহারই মাত্র পনর মাইল ব্যবধানে অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে যে শবর জাতি বাস করে, তাহারা এখনও পৃথিবীর আদিম সমাজ-ব্যবস্থা অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া চলিযাছে। শবর জাতির সমাজের মতই কোন এক সমাজ-জীবন যে ক্রমপরিণতির পথ অনুসরণ করিয়া কোন কোন অঞ্চলে ভারতীয় আধুনিকতম সমাজ জীবনের পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহা অনুভব কবিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আজ পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই সুলভ নহে। ভারতের সমাজ একদিক দিয়া কোন কোন অঞ্চলে যেমন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজের আদর্শে নবতম রূপ ধারণ করিয়াছে, আবার এই দেশেরই একটি সুবৃহৎ অংশ এখনও আদিম সমাজ ব্যবস্থার অধীন। এই বিভিন্ন প্রকৃতিব সমাজ জীবন গভীরভাবে অনুশীলন কবিলেই মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও সামাজিক জীবন-গঠনে মনুষ্য সমাজের প্রয়াস ইত্যাদি বিষয়ক মৌলিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই জন্য আমাদের পাশ্চাত্ত্য প্রণালী অনুসরণ কবিলেও পাশ্চাত্ত্য তথ্য অনুশীলন করিবার কিছু প্রযোজন হয না। অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদেব দেশেব যে সকল ব্যক্তি নৃবিদ্যায় অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় সমাজ-জীবন সম্পর্কে বিশেষ কোনও সংবাদই রাখেন না ; আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া কিংবা প্রশান্ত মহাসাগ-রীয় দ্বীপ পুঞ্জের অধিবাসী আদিম জাতিই প্রধানতঃ তাহাদের আলোচনার ভিত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদেব দেশে আমাদের নিজেদের মত করিয়া আমাদের সমাজ-জীবন সম্পর্কে এখনও কোনও গবেষণার সূত্রপাত হয নাই। আমাদের নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের একটি সুমহান্ দাযিত্ব এই যে বহু ভাষাভাষী ও বহু বিচিত্র মানবজাতি অধ্যুষিত এই বিশাল দেশেব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদেব এই বিষযক অনুশীলন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাতে পাশ্চাত্ত্য প্রণালী অবলম্বন করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য তথ্য যদি ইহার একমাত্র অবলম্বন হয, তবে এ'দেশের পক্ষে সে আলোচনায় কোনও উপকার হইবে না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এ'দেশে প্রবর্তিত হইবার পর হইতে পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য বিষযক জ্ঞানের মত নৃবিদ্যাও

এ'দেশে কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে, একথা সত্য ; কিন্তু সে আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্ত্য তথ্য নির্ভর, আমরা আফ্রিকার বান্টু কিংবা হোটেন্‌টট্‌ জাতির কথা যত জানি, আমাদেরই প্রতিবেশী বীরহোড় কিংবা কোরোয়া জাতির কথা তত জানি না। এমন কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়েও পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থকারদিগের রচিত গ্রন্থাদি অনুসরণ করা হয় বলিয়া ভারতীয় আদিবাসী কিংবা লোক-সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান কোন দিক দিয়াই প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এই ত্রুটি হইতে পরিত্রাণ আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।

এ'দেশের অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদ্‌ই 'নৃ' বাদ দিয়া কেবল মাত্র তত্ত্বটিরই সাধনা করিয়াছেন ; যদি তাহা না হইত, তবে মস্তিষ্ক হইতে মগজটুকু বাদ দিয়া কেবল মাত্র ইহার খুলিটুকু লইয়াই তাঁহারা এমন মত্ত থাকিতে পারিতেন না, হৃদয় বাদ দিয়া কেবল মাত্র পঞ্জর লইয়া খট্‌মট্‌ আওয়াজ তুলিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার ভ্রান্তি পাশ্চাত্ত্য জগৎ ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করিয়াছে, কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ী বা শারীর নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ যে এখনও সেই সনাতন পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতেছেন, সে সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সেই চেতনাও আজ আসিয়াছে, সেই জন্য একান্ত নৃতত্ত্ব বাদ দিয়া ব্যাপক ভাবে লোক-সংস্কৃতির চর্চা করা প্রয়োজন হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, যাঁহারা শব-সাধক নহেন, ভারতীয় সমাজ-জীবনের বৈচিত্র্য ও প্রাণশক্তি নিজেদের অন্তরে অনুভব করিয়া যাঁহারা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার এই চলমান ও জীবন্ত রূপটিকেই যাঁহারা তাঁহাদের সাধনার ভিতর দিয়া রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারাই ভারতের যথার্থ পরিচয়টি উদ্ধার করিতে পারেন। লোক-সংস্কৃতি জীবিত বিষয়ের সাধনা, পাশ্চাত্ত্যের নৃবিদ্যা শবসাধনা মাত্র। জীবিতের মধ্যে সৌন্দর্য ও প্রাণ-শক্তির অনুভূতি লোক-সংস্কৃতির লক্ষ্য, জড়ের মধ্য হইতে জীবন-সন্ধানের প্রয়াস পাশ্চাত্ত্য নৃবিদ্যার লক্ষ্য। জীবিতের অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্ত্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ জড় কঙ্কালের অনুশীলন করিয়াছেন বলিয়াই তাহা কোনও চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে নাই, লোক-সংস্কৃতির অনুশীলন জড়-বস্তুর সাধনা নহে বলিয়াই ইহার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

ভূমিকা

পৃথিবীর মধ্যে যত দেশ ও মহাদেশ আছে তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ইহার লোক-সংস্কৃতি বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ইউরোপের ভূখণ্ড হইতেঅষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ পর্যন্ত যে স্থলপথ বিভিন্ন মানবজাতির যাতাযাতের পথ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, কিংবা দক্ষিণ ভারতের যে সুবিস্তৃত উপকূল রেখা ধরিয়া ইউরোপের উপকূল হইতে চীনের উপকূল পর্যন্ত জল পথ বিস্তৃত রহিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহাদের মধ্য-স্থলে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের পথে যে সকল জাতি আমেরিকায় একদিন গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, একমাত্র তাহাদের কথা বাদ দিলে পৃথিবীর অন্যান্য যে সকল অংশে মানবজাতির যাতাযাত চলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ বাদ দিয়া কেহ কোনদিন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আজ যে সকল বিভিন্ন মানবজাতি নিজেদের স্বাধীন পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহাদের প্রত্যেকটি জাতিরই অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম মনুষ্য জাতি খর্বকায় নেগ্রিটো হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ইউরোপের নর্ডিক জাতির বংশধর পর্যন্ত আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করিতেছে। শুধু বসবাসই যে করিতেছে, তাহা নহে ; কারণ, বিভিন্ন জাতি যদি নিজস্ব স্বকীয়তা বিসর্জন না দিয়া, স্বাধীনভাবে বাস করিতে থাকে, তখন লোক-সংস্কৃতি কিংবা সমাজ-বিজ্ঞানের দিক হইতে তাহার কোন মূল্য প্রকাশ পায় না। এইভাবে আফ্রিকায় বিভিন্ন শ্বেতকায় জাতি আজও বাস করিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে নেগ্রিটো হইতে আরম্ভ করিয়া নর্ডিক পর্যন্ত জাতি নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই—বরং তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া এই বিপুল দেশের মধ্যে একাকার হইয়া বাস করিতেছে। যথার্থ লোক-সংস্কৃতি এই পরিবেশেই বিকাশ লাভ করিতে পারে। বিভিন্ন জাতি একদেশে বাস করিয়াও যেখানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয় নাই, সেখানে কোনও সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘকাল যাবৎ শ্বেতকায় জাতি বসবাস করিতেছে, কিন্তু তাহারা নিজেদের চারিদিকে এমন একটি কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে, সেখানে তাহারা যেন সে দেশের জলবায়ুকেও নিজেদের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইতে পারিতেছে

না। তাহার ফলে সংঘর্ষেরই সৃষ্টি হইতেছে, কোন প্রকার ঐক্যের সৃষ্টি হইতে পারিতেছে না। ঐক্যের মধ্য দিয়া সংস্কৃতির বিকাশ হইয়া থাকে, অনৈক্যের ভিতর দিয়া বিরোধের মাত্রাই বাড়িয়া চলে। ভারতবর্ষ বিভিন্ন কালে এ'দেশের মধ্যে আগত নূতন নূতন জাতিকে আশ্রয় দিয়াছে, আহার্য দিয়াছে, বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে সাংস্কৃতিক উপকরণ গ্রহণ করিয়া নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ করিতেছে। ইউরোপের জাতি সমূহের মত ভারতবর্ষ প্রথম হইতেই কেবল মাত্র যদি ছুৎমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিত, তবে ইহার সংস্কৃতি রক্ষা পাইত না, বিনাশ প্রাপ্ত হইত। পৃথিবীর বহু জাতি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার দুরন্ত প্রযাসে নিজেদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষ এই পথে কোনদিনই অগ্রসর হয় নাই. সেই জন্য এ'দেশের জাতীয় সংস্কৃতি পুষ্টি লাভ করিয়াছে, কোন দিনই বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ঐক্যের উপলব্ধি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষ যেমন এক ভাষাভাষী নহে, তেমনই একটি অখণ্ড সাংস্কৃতিক জীবনও তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তথাপি ভারতীয় জীবনে এমন কতকগুলি সাংস্কৃতিক উপকরণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, যাহা এই বিভিন্ন ভাষাভাষী বিচিত্র জাতি অধ্যুষিত দেশের মধ্যেও একটি সুদৃঢ় ঐক্য বন্ধন আনিয়া দিয়াছে। হিন্দু ধর্ম তাহাদের অন্যতম হইলেও এ'কথা সত্য, ভারতবর্ষ কেবলমাত্র হিন্দুরই দেশ নহে। বিশেষতঃ উচ্চতর সমাজ ব্যতীত অন্যত্র হিন্দুধর্মের প্রভাবও খুব কার্যকর নহে। ভারতের আড়াই কোটি আদিবাসীর যেমন স্বতন্ত্র ধর্ম আছে, তেমনই এ'দেশের হিন্দু মুসলমানও ধর্মীয় জীবনে স্বতন্ত্র আচার পালন করিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-আদিবাসী জাতির মধ্য দিয়াও একটি অখণ্ড ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহার কারণ, যে যে-ধর্মমতই পোষণ করুক না কেন, এ'দেশের প্রকৃতি ইহার সমগ্র মানুষের মনের উপর একটি অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার পরিচয় বাহির হইতে খুব প্রত্যক্ষ না হইলেও, একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি করা যাইবে। বৌদ্ধধর্মকে যে আজ হিন্দুধর্ম গ্রাস করিতে পারিয়াছে, ইহার অর্থই এই যে,

ভূমিকা

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের উপাদান ও প্রেরণা বর্তমান ছিল ; খৃষ্টানধর্ম যে আজ ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া নিজের অধিকার স্থাপন করিযাছে, ইহাবও অর্থই এই যে, খৃষ্টানধর্মের মধ্যেও এ'দেশের ধর্ম প্রেরণার অস্তিত্ব ছিল। এই বাহিরেব দিক দিযা আচাবগত যে পার্থক্যই দেখা যাউক, ভাবতের বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীব ভিতরও ঐক্যেব সন্ধান পাওযা যায। সেই ঐক্যের ভিত্তিতেই ভাবতবর্ষে এক অখণ্ড লোক-সংস্কৃতি জন্মলাভ কবিয়াছে।

ভারতেব জন-সাধারণেব সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য ও বসবোধ অবলম্বন কবিযাই এ'দেশেব লোক-সংস্কৃতিব বিকাশ হইযাছে। ইহা পুঁথিপাঠ্য বিষয নহে, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিব বিষয়। সহানুভূতি ও বসসচেতনতা লইযা এ'দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাব মধ্য হইতেই বৃহত্তব ভারতেব মর্মস্থলটি লক্ষ্য গোচর হইবে। ইতিহাসেব মধ্যে যে ভাবতকে আমবা পাই, তাহা ভাবতেব বহিবঙ্গরূপ মাত্র, কিন্তু তাহাব অন্তর্লোকে পৌঁছিতে হইলে ইহাব লোক-সংস্কৃতিব সহাযতা ভিন্ন উপায নাই—আমবা অন্তবেব পবিচযই পাইতে চাই, বাহিবেব কঙ্কালেব বন্ধনে যে পবিচয সীমাযিত, তাহাতে আমাদেব কিছু প্রযোজন নাই।

ধর্ম ও লোকাচার

পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ ধর্ম্মের যে সংজ্ঞাই দিন না কেন, ইহার ভারতীয় সংজ্ঞাটির মত তাহা এত ব্যাপক নহে। ভারতীয় সংজ্ঞা অনুসারে যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। জীবনকে যাহা ধারণ করিয়া আছে, কিংবা জীবন যাহা ধারণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম। ধর্মের প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞায় পার্থক্য হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। কারণ, পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসিগণ যে দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাহা প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে স্বতন্ত্র। অতএব পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে ধর্মের ভারতীয় এই সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক বলিয়া বিবেচিত হইলেও ভারতীয় মাত্রেরই নিকট ইহা নিতান্তই যথার্থ বলিয়াই বিবেচিত হইবে। পাশ্চাত্ত্য মতে ধর্ম জীবনের একটি বহিরঙ্গ, কিন্তু প্রাচ্য মতে ইহা জীবনের অবলম্বন—ধর্ম ব্যতীত ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টির কোন পরিচয় নাই।

ধর্মের এই ভারতীয় সংজ্ঞা অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীব মাত্রেরই ধর্ম আছে। পশুপক্ষীর জীবন ধারণ করিবার জন্য আহারের প্রয়োজন আছে। সেইজন্য আহার পশুপক্ষীর ধর্ম ; আহার, নিদ্রা, প্রযজন জৈব ধর্ম। কিন্তু ইংরেজিতে 'religion' শব্দকে যখন বাংলায় ধর্ম বলিয়া অনুবাদ করি, তখন ধর্ম শব্দটির যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করা হয় না। একজন জার্মেণ পণ্ডিতের মতে 'religion'-এর সংজ্ঞা এই, 'it is the knowledge and consciousness of dependence upon one or more transcendental, personal powers, to which man stands in a reciprocal relation.' বাহিরের দিক হইতে (objectively), 'it is the sum of the outward actions in which it is expressed and made manifest, as prayer, sacrifice, sacraments, liturgy, ascetic practices, ethical prescriptions and so on.' ইহার মতে মূল বৌদ্ধধর্ম কোন অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী নহে বলিয়া ইহাকে ধর্ম বলা যায় না, ইহা দর্শন মাত্র। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ religion কথাটিকে কত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব ইহা দ্বারা ভারতীয় ধর্ম কথাটির অর্থ পরিষ্কার হইতে পারে না।

ভূমিকা

পাশ্চাত্ত্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও স্বভাবতঃই 'religion' কথাটিকে ইহার পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা অনুযায়ীই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথা সত্য যে, 'religion' কথাটির যাহা মৌলিক লক্ষ্য, নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য সমাজের মধ্যে সেই উপকরণের সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক অভাব আছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য উপজীব্য তথাকথিত আদিম সমাজের অধিবাসিগণ যে 'ধর্ম' পালন করিয়া থাকে, তাহার সঙ্গে খৃষ্ট ধর্ম, ইস্‌লাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতির কতকগুলি মৌলিক বিষযে পার্থক্য আছে। এইজন্য প্রকৃত খৃষ্টধর্ম কিংবা ইস্‌লাম ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়, totemistic religion, animistic religion প্রভৃতি বলিতে সেই ধরনের কিছু বুঝায় না। সেইজন্য যদিও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও 'religion' কথাটীর পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা অনুযায়ীই ইহা তাহাদের আলোচ্য আদিম জাতি সম্পর্কেও প্রয়োগ করিতে চাহেন, তথাপি কার্যতঃ এই ক্ষেত্রে আসিয়া শব্দটির অর্থের আরও সঙ্কোচ ঘটে। সভ্য ধর্ম ও আদিম ধর্মের পার্থক্যটুকু বুঝিতে পারিলে উল্লিখিত বিষযটি বুঝিতে আরও সহজ হইবে।

সভ্যজাতির ধর্মসমূহের প্রধান কথাই হইল যে, ইহার আধ্যাত্মিক চৈতন্যটি একজন ব্যক্তি বিশেষের হৃদযে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হয। এই ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিযা ও তাঁহার বাণীকে অবলম্বন করিয়া সেই ধর্ম প্রচার লাভ করে। যীশু খৃষ্ট, হজরত মোহাম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য ইহাঁরা নিজের একান্ত আত্মিক সাধনা দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করিযাছিলেন, শুধু সত্যোপলব্ধিই নহে, আত্মপ্রত্যয ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার মত শক্তি তাঁহাদের ছিল; তাহা দ্বারা তাঁহারা পারিপার্শ্বিক সমাজের সংশযকে জয করিযা নিজেদের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিযাছেন। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদের ত্যাগ, সাহস ধৈর্য্য সব কিছুকেই বরণ করিতে হইযাছিল। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে ক্রমে তাহাদের এই কঠোর সাধনার দিকটা আচ্ছন্ন হইযা গিয়া ক্রমে তাঁহাদের ব্যক্তিত্বটিই আকাশস্পর্শী হইয়া উঠে। প্রবর্তকের বিরাট ব্যক্তিত্বের আকর্ষণই শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধর্মেরই মর্মকথা হইযা দাঁড়ায।

দ্বিতীয়তঃ সভ্যজাতির ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহাদের একটি প্রবল নৈতিক আবেদন আছে। প্রত্যেক উচ্চ ধর্মই একটি উচ্চ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে নৈতিক শক্তি দ্বারা সমাজমাত্রেরই সংহতি রক্ষা পায়,

প্রত্যেক উচ্চতর ধর্মেরই ভিত্তিমূলে সেই নৈতিক শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

তারপর প্রত্যেক উচ্চতর ধর্মই সত্য ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা ক্রমে দেশ-কাল-পাত্র নিবপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। এশিয়ার তিন প্রান্তে যে তিনটি উচ্চতর ধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে দেশ ও কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে মনে করেন, উচ্চতব ধর্মেব একটি সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও আছে—এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই এই ধর্ম দেশান্তবে প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কেবল বাষ্ট্রশক্তির বলেই যদি ধর্ম দেশান্তবে প্রচার লাভ কবিত, তবে সেই বিশেষ রাষ্ট্রশক্তির পতনেব সঙ্গে সঙ্গেই ইহাবও পতন হইত। অতএব ধর্ম দেশ-কাল-নিবপেক্ষ হইতে পাবে ইহাব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্য নহে, ইহার অন্তর্নিহিত সত্যেব বলে। খৃষ্টধর্মেব মধ্যে যদি কোন সত্য না থাকিত, তবে যখন ইহা প্রথম উদ্ভূত হয়, তখন ইহাব উপব চাবিদিক হইতে যে রাজবোষ পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাব ফলে ইহা কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইত। তাহা হইলে বহুদিনেব সাম্রাজ্য বল হাবাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম আজও পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোকেব মধ্যে আত্মবক্ষা করিয়া থাকিতে পাবিত না।

উচ্চতব ধর্মেব আব একটি প্রধান গুণ ইহাব স্বাতন্ত্র্য-নিষ্ঠা। এক একটি বিশেষ ধর্ম যে আধ্যাত্মিক নৈতিক ও আচাবগত বিধি (code) গড়িয়া তোলে, কোন ক্রমেই তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে দেওয়া হয় না। তাহাব ফলে কালের ব্যবধান যতই বাড়িতে থাকে, বহুলাংশে ততই তাহা অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। ধর্মেব এই অর্থহীন উপকরণগুলি ক্রমে কুসংস্কাবরূপে পুঞ্জীভূত হইয়া সমাজের গতিপথ বোধ কবিয়া দেয়। ইহাদিগেব মৌলিক তাৎপর্যও যেমন আর উদ্ধার হয় না, আবাব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করাও সম্ভবপর হয় না।

আদিম জাতির ধর্মে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি সাধনাব কোন কথা নাই, ব্যক্তি-চৈতন্যমূলক কোন আধ্যাত্মিক সত্যোপলব্ধিবও কোন ইঙ্গিত নাই। সর্বজনীন মানসিক বৃত্তিগুলিই সমভাবে তাহাদের ধর্মবোধের ভিত্তি। ব্যক্তিবিশেষের কোন আত্মকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক চৈতন্যের উপরে তাহার ভিত্তি নহে।

উপজাতির ধর্ম সকল সময়েই যে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা নহে। স্থূল কথা, নীতি তাহার লক্ষ্য নহে, তবে অনেক সময় ইহাদেরও নৈতিক বল যে অনুভব না করা যায়, তাহাও নহে। ইহাদের ধর্মচৈতন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়াই তাহা দেশ কাল ও পাত্র নিরপেক্ষ হইতে পারে না। তাহা বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ ও প্রত্যক্ষ জীবনের ভয়-ভাবনা-দুঃখ-নৈরাশ্য কণ্টকিত; এই ঐহিক জগৎ-নিরপেক্ষ অপ্রত্যক্ষলোকের সম্পর্কে কোন অনুভূতি ইহাতে নাই। কিন্তু সভ্যজাতিব ধর্মের সঙ্গে আদিম জাতির ধর্মের প্রধান পার্থক্য—সভ্য ধর্ম অন্য ধর্মের সকল উপকরণই পরিত্যাজ্য বলিযা বিবেচনা করে, কিন্তু আদিম জাতিব ধর্ম অন্য ধর্মের উপকরণকেও স্বচ্ছন্দে নিজের মধ্যে স্থান দেয। আদিম জাতিব ধর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনায এই বিষযটিব একটি বিশেষ মূল্য আছে।

অতএব দেখিতে পাওযা গেল, উচ্চতব জাতি সমূহেব সম্পর্কে 'religion' কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করা চলে, তথাকথিত আদিম জাতিব ধর্ম সম্পর্কে তাহা সেই ভাবে ব্যবহাব কবা চলে না। কাবণ, উভযের ধর্মেব মৌলিক উপাদান এক নহে। সেইজন্য 'religion' কথাটিব মধ্যে সভ্যজাতিব সম্পর্কে যে ভাব ও বস্তু বুঝাইবে, আদিম জাতি সম্পর্কে প্রকৃত পক্ষে সেই প্রকাব ভাব ও বস্তু বুঝাইবে না। কারণ, একেব মধ্যে যাহা আছে, অন্যেব মধ্যে তাহা নাই। সেইজন্য কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ আদিম জাতিব ধর্ম সম্পর্কে 'religion' কথাটির ব্যবহারই করিতে চাহেন না। একজন 'native cults' কথাগুলিব ব্যবহার করিযাছেন। কথা দুইটি যে কি ভাবে বাংলায প্রকাশ করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। লৌকিক ধর্ম কথা দুইটি দ্বাবা ভাবটি এক প্রকাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও 'ধর্ম' কথাটি আসিযা পডে। 'religious behavior' কথাগুলিও কেহ এই সম্পর্কে ব্যবহাব কবিতে চাহেন। কথাগুলিকে ধর্মীয আচরণ বলিযা অনুবাদ করা যায।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ আদিম কথাটিও এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিযা থাকেন। জাতি কিংবা ধর্ম সম্পর্কে যখন তাঁহারা আদিম কথাটি ব্যবহার করিযা থাকেন, তখন তাঁহারা অবশ্য মনে করিতে চাহেন, পৃথিবীর আদিম অবস্থার মানব কিংবা ধর্ম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা যে সকল মানব-সমাজ কিংবা তাহাদের ধর্ম

লইয়া আলোচনা করেন, তাহারা পৃথিবীর আদিম অবস্থার মানব-সমাজ কিংবা তাহার ধর্মের কোন পরিচয় দিতে পারে না। তাহারা বর্তমানেরই মানব, তাহাদের ধর্মের তথ্যও বর্তমান কালেই তাহাদের মধ্য হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় আদিম কথাটি কালবাচক না হইয়া এক বিশেষ গুণ-বাচক হইয়া দাঁড়ায় মাত্র। এই তথাকথিত আদিম সমাজের একটিমাত্র গুণ—ইহা তথাকথিত উচ্চতর সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ; তাহার বেশি আর কিছু বলিতে পারা যায় না। কেহ মনে করেন, আদিম কথাটি দ্বারা অপেক্ষাকৃত সরলতার ভাব বুঝায়। কিন্তু ইহা সমর্থন যোগ্য নহে। কারণ, সরল বা simple কথাটি একটি আপেক্ষিক শব্দ। কাহারও দৃষ্টিতে জীবন-ধারণ পদ্ধতি নিজেদের তুলনায় বাহির হইতে সরল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কোন কোন তথাকথিত আদিম জাতির জীবন-ধারণ-পদ্ধতি নানা বিষয়ে এতই জটিল যে, তাহাকে 'সরল' বা simple কথা দ্বারা নির্দেশ করিতে গেলে প্রকৃতই ভুল হয়। ভারতীয় অধিকাংশ হিন্দুর জীবন অত্যন্ত সরল, অবশ্য plain living অর্থে যদি এই 'সরল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবেই অধিকাংশ হিন্দুর জীবনকে 'সরল' বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কিন্তু সেইজন্য হিন্দুধর্মকে আদিম ধর্ম বলিতে পারা যায় না। উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত কোরাপুট জিলায় গুনুপুর তালুকের তথাকথিত আদিম জাতি শবরদিগের জীবন আমার প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ইহাদের ধর্ম ও আচারগত জীবন আচার-বহুল হিন্দুদিগের জীবন হইতেও জটিল। অতএব নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ উপজাতির ধর্ম নির্দেশ করিতে যখন আদিম কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তখন ইহা কালবাচক ত বুঝায়ই না—এমন কি, গুণবাচকও বুঝায় বলিয়া মনে হয় না। যদিও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ আদিম জাতির সঙ্গে আদিম ধর্ম কথাটি একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তথাপি ধর্ম সম্পর্কে কথাটির তাৎপর্য শেষ পর্যন্ত অন্যরকম হইয়া দাঁড়ায়। অতএব আদিম ধর্ম কথাটি না বলিয়া আদিম জাতির ধর্ম বলিলে কথাটির কোন রকম অর্থ হইতে পারে। আদিম ধর্ম বলিলে ইহার অর্থবোধ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

আদিম জাতির ধর্ম বিষয়ক যে সমস্ত পুস্তক এ যাবৎ বিশেষজ্ঞগণ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, প্রশান্ত

মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের অধিবাসী বিশেষতঃ মালেনেসিয়া সম্পর্কেই সাধারণতঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহাতে যে সকল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ধরণের। অথচ ভারতবর্ষে এখনও আড়াই কোটী আদিম অধিবাসীর বাস। যে ভাবে অন্যান্য দেশের আদিম জাতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেইভাবে আলোচনা যে একেবারে হয় নাই তাহাও নহে। কিন্তু তথাপি সামাজিক নৃতত্ত্ববিষয়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোন গ্রন্থেই ভারতীয় আদিমজাতির ধর্ম ও অন্যান্য সামাজিক রীতি-নীতি তেমন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। সামাজিক নৃতত্ত্ববিষয়ে কোন সাধারণ সংজ্ঞা প্রণয়নের পূর্বে ভারতীয় আদিম জাতির জীবনও যে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতে পারে এ' কথা বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃতত্ত্ববিদ্‌ই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। একজন মাত্র ইংরাজ নৃতত্ত্ববিদ্‌ তাঁহার রচিত পুস্তকাদিতে ভারতীয় উপকরণ সমমর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করিযাছেন; তিনি জেম্‌স্‌ ফ্রেজার। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদ্‌ই নিজেদের নিতান্ত পরিচিত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অধিকদূর অগ্রসর হন নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদ্‌ই কোন বিষয়ে একটি কিংবা দুইটি দৃষ্টান্ত পাইযাই তাহা দ্বারাই পৃথিবীব্যাপী সমগ্র উপজাতির উপর প্রযোজ্য সাধারণ সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া থাকেন। প্রশান্ত মহাসাগরে একটি মাত্র দ্বীপে বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা একজন নৃতত্ত্ববিদ্‌ সমগ্র উপজাতির সামাজিক জীবন সম্পর্কিত বহু সাধারণ সংজ্ঞা প্রণয়ন করিযাছেন। তাঁহার এই একান্ত ও বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিযা তিনি সামাজিক নৃ-বিজ্ঞান বিষযক বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনার খ্যাতি অর্জন করিযাছেন। প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও নিত্য নিয়মানুবর্তী প্রাকৃতিক বস্তু সম্পর্কেই মানুষ আজ পর্যন্ত নির্ভুল সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারিযাছে কি না সন্দেহ। অতএব মানব-প্রকৃতির মত এমন জটিল ও রহস্যপূর্ণ বিষয সম্পর্কে সংজ্ঞা নিরূপণ করিবার পূর্বে কতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া লওযা প্রযোজন, তাহা সহজেই অনুমেয। এই অবস্থায যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী, প্রত্যেকটি উপজাতির জীবনের প্রত্যেকটি স্তর বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের জীবন সম্পর্কে কোন সাধারণ সংজ্ঞা নিরূপণই নির্ভুল হইবে না।

কয়জন মানুষ নিজেকে নিজে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে ? বিস্মৃত পিতা-মহের রক্তধারার সঙ্গে কত বংশ পরম্পরায় কুলক্রমাগত সংস্কার ও প্রবৃত্তি যে আসিয়া তাহার জীবনের স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইতেছে, তাহা কেহই হিসাব করিয়া বলিতে পারিবে না। নৃতত্ত্ব ও পশুতত্ত্বের (Zoology) মধ্যে এইখানে পার্থক্য। সেইজন্যই নৃতত্ত্বই জটিলতম প্রকৃতি-বিজ্ঞান (Natural Science) ; অতএব অন্য কোন বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ সংজ্ঞা রচনা সহজসাধ্য হইলেও নৃ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহা হইতে পারে না। সেইজন্য মনে হইবে যে পৃথিবীর কোন অংশের কোন মানবজাতিকেই উপেক্ষা করিয়া মানবজাতি-সম্পর্কিত কোন সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না।

ভারতীয় পাঠকের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞের নৃতত্ত্ব বিষয়ক কোনও গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলেই প্রথমতঃ এই অসুবিধায় পড়িতে হয়। আমেরিকা মহাদেশের বিশিষ্ট প্রকৃতি সেই মহাদেশের মানবপ্রকৃতি গঠন করিবার সহায়ক হইয়াছে। আমেরিকার বিস্তৃত প্রাকৃতিক পটভূমিকা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া যখন সেখানকার একটি কিংবা দুইটি চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করি, তখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। শুধু মানুষ কেন, কোন জড় পদার্থকে বুঝিতে হইলেও ইহার পারিপার্শ্বিক ইতিবৃত্ত জানিতে হয়। মানুষের ধর্ম, আচার, তাহার জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি তেমনই তাহার বিস্তৃত প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর স্থাপিত। এক হইতে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। যখন এককে দেখিবার প্রয়োজন হয়, তখন অন্যকেও সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত না করিলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। সেইজন্য ভারতীয় পাঠকের পক্ষে তাহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এই বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান কোন-ভাবেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শুধু ভারতীয় পাঠকই বা বলি কেন, আড়াই কোটি ভারতীয় উপজাতীয়ের বিচিত্র জীবন-ধারার সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেও পাশ্চাত্ত্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রদত্ত উপজাতি সম্পর্কিত সাধারণ সংজ্ঞামাত্র অনুসরণ করিয়া সেই পরিচয় লাভ করা সম্ভব নহে। তাহাদিগকেও যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষভাবেই ইহাদের মধ্য হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে ; নতুবা তাহাদেরও জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের প্রায় আড়াই কোটি অধিবাসী উপজাতির সংজ্ঞাভুক্ত। এই

ভূমিকা

আড়াই কোটি লোকের মৌলিক বা জাতিগত পরিচয় এক নহে। আমেরিকা কিংবা অষ্ট্রেলিয়ার উপজাতীয় লোকদিগের মধ্যে যেমন মৌলিক পরিচয়ে বিশেষ বৈচিত্র্য নাই, আফ্রিকা কিংবা ভারতীয় উপজাতির মধ্যে তেমন নহে। এমন কি, উত্তর আফ্রিকার কথা বাদ দিলে দক্ষিণ আফ্রিকার উপজাতি অপেক্ষা ভারতবর্ষের উপজাতির মধ্যে বৈচিত্র্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মানব-জাতির নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রধান শাখা আসিয়া ক্রমে নিজেদের বসতি স্থাপন করিয়াছে। যেমন নেগ্রিটো, আদি-অস্ত্রাল, ভূমধ্যসাগরীয়, মোঙ্গলয়েড ও নর্ডিক্। ইহাদের মধ্যে ভারতীয় আর্যভাষী জাতি ও বিশেষভাবে আর্য প্রভাবিত জাতি ভিন্ন আর সকল জাতিই সাধারণভাবে উপজাতি বলিয়া গণ্য হয়। স্থূল কথা এই দাঁড়ইতেছে যে, ভারতে এক আর্যভাষী জাতি ভিন্ন আর সকলেই উপজাতি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ঠিক নহে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞান শাস্ত্রটি আর্যাভিমানী জাতির সৃষ্ট বলিয়া আর্যেতর সমস্ত জাতিই প্রায় উপজাতীয়ের সংজ্ঞার মধ্যে পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সমগ্রভাবে দ্রাবিড়ভাষী জাতিকেই উপজাতি বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। ভারতীয় আর্যভাষীগণ যে সভ্যতার বহুবিধ উপাদানের জন্য দ্রাবিড়ভাষী জাতির নিকট ঋণী, তাহা আজ আর কেহ অস্বীকার করতে পারেন না। তবে ভারতে আর্য বিজয়ের পর দ্রাবিড়ভাষী জাতির মধ্যে কৃষ্টিগত অবনতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। আর্য প্রতিভার ক্রম প্রকাশমান দীপ্তির সম্মুখে দ্রাবিড় কৃষ্টির অবনতির প্রতিরোধ আর কোনকালেই সম্ভব হয় নাই ; অতএব অবনতির পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে আজ তাহাদেরই কোন কোন বংশধর উপজাতির পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। দ্রাবিড়ভাষী জাতি ভারতের অতীত ইতিহাসের পত্রে নিজেদের পরিচয় লিখিয়া রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে এই গৌরবজনক তথ্যটুকু আমরা জানিতে পারি। এইভাবে কে বলিবে কত জাতি কত বিস্মৃত ইতিহাসের পত্রে একদিন নিজের স্বাক্ষর লিখিয়া রাখিয়াছিল, সেই তথ্য মানুষের স্মৃতি ও জ্ঞানগম্য নহে বলিয়া আজ তাহারা আর সভ্য সমাজের পংক্তিভোজনে আসন লাভ করিতে পারিতেছে না।

ভারতীয় উপজাতি সমুহের মধ্যে নেগ্রিটো জাতি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিতদিগের মতে ইহারা পৃথিবীর একটি অত্যন্ত প্রাচীন জাতির বংশধর। কিন্তু ভারতবর্ষে বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তাহাদিগের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্রভাবে কোন পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব নহে। বিশেষতঃ যে অল্প সংখ্যক নেগ্রিটো এখনও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে যে কতখানি অন্যান্য জাতির রক্ত আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। সংখ্যাল্পতার জন্যই ইহাদের সংস্কৃতিগত অধঃপতনও ঘটিয়াছে; সেইজন্য নৃতত্ত্ববিষয়ক কোন আলোচনায় এখন আর ইহাদিগকে ভিত্তি করিয়া বিশেষ মৌলিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। দ্রাবিড়ভাষী জাতির বংশধরগণও সংখ্যায় এত বিপুল এবং তাহার ফলেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কৃষ্টির সম্মুখীন হইয়া বর্তমানে এত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কোনও আলোচনা করাও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের জীবনের মধ্যে বহিরাগত উপকরণ প্রচুর পরিমাণে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। ভারতীয় উপজাতির মধ্যে মোঙ্গলোয়েড জাতি ও আদি-অস্ত্রাল জাতিই এখনও কতকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকিতে সক্ষম হইযাছে। ভারতীয় নৃতত্ত্ববিষয়ক কোন আলোচনায় ইহারা এখনও অনেকটা নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। আদি-অস্ত্রাল জাতি ভারতীয় সমতল ভূমির অধিবাসীদিগের নিকট মোঙ্গলয়েড্ জাতি অপেক্ষা অধিকতর পরিচিত। অবশ্য আদি-অস্ত্রাল জাতির সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক কালেই মোঙ্গলযেড জাতিরও মিশ্রণ হইয়াছে। এমন কি, উড়িষ্যার কয়েকটি অষ্ট্রীক ভাষাভাষী জাতির আকৃতি দেখিলে সহসা ইহাদিগকে মোঙ্গলয়েড্ জাতির বংশধর বলিয়াই মনে হইবে। হয়ত ইহারা তাহাই। এই বিশেষ বিস্তৃততর অনুসন্ধানের এখনও বাকী আছে। তবে একথা সত্য, আদি-অস্ত্রাল বলিয়া পরিচিত ভারতীয় উপজাতির যে শাখা পশ্চিমবঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ বিহার এবং সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ দিয়া মধ্যপ্রদেশেরও পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সভ্য সমাজের অল্পবিস্তর পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা আসামের চা বাগানে, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা খাদে এবং অন্যান্য নানা ভাবে জীবিকার্জনের জন্য আসিয়া সাধারণের দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছে।

ভূমিকা

মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম নির্দেশ করিতে যাওয়ার মধ্যে প্রতি পদেই ভুল হইবার আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ ভারতীয় উপজাতিসমূহ কত সহস্র বৎসর ধরিয়া কত জাতির সঙ্গে মিশ্রণের ফলে যে বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিবে না। ভারতীয় যে সকল উপজাতির কথা পূর্বে উল্লেখ করিলাম, তাহাদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহাও মানুষের জ্ঞানগম্য নহে। এই অবস্থায় যদি তাহারা ভারতবর্ষের বাহির হইতেই আসিয়া থাকে, তবে এই দেশে আসিয়া পৌঁছিবার পথে কত জাতির রক্ত যে তাহারা শিরায় বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, তাহাই বা কে হিসাব করিয়া বলিবে ? বাহ্যতঃ মনে হইতে পারে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেব বক্তবিন্দুর সন্ধান করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন যে সেই রক্তবিন্দুর একটি কণিকার মধ্যে কোন এক বিপবীতধর্মী জাতির বিশেষ কোন বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি সমাহৃত হইয়া থাকিতে পারে। তাহারই আবির্ভাবেব ফলে তাহার বংশধরদিগেব মধ্যে চারিত্রিক বিরোধ সৃষ্টি হইতে পারে।

তবে এ কথাও সত্য যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ বৃত্তি আছে ; এই সাধারণ বৃত্তিগুলির অধিকারী হওয়ার জন্যই মানুষ দেশ ও কাল নিরপেক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সঙ্গে আবার এ' কথাও অস্বীকাব করিবার উপায় নাই যে, মানুষের এই স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সেইজন্য মেরুচারী বেদুইন ও বৃন্দাবনচাবী রাখালের চরিত্র এক হইতে পারে না। নির্মম প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া এক জাতির অন্তরের যে বৃত্তিগুলিকে সর্বদা সজাগ রাখিতে হয়, স্নেহময়ী প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারেব নীচে দাঁড়াইয়া অন্য জাতিকে সেই সব বৃত্তির কথা কোনদিন স্মরণও করিতে হয় না। কালক্রমে পারিপার্শ্বিক এই বৈশিষ্ট্যগুলি জাতিগত হইয়া পড়ে। সেইজন্য একই উড়িষ্যা প্রদেশের প্রায় প্রতিবেশিরূপে বাস করিয়াও বোণ্ডা জাতি নরহত্যাপ্রবণ, গদ্‌বা জাতি নৃত্যগীতকুশল ও শবর জাতি ধর্মাচারপরায়ণ হইয়াছে।

বিশেষতঃ সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া সর্বদা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহা অধিকাংশ সময়েই সাধারণ মানবিক বৃত্তিজাত বলিয়া মনে হইবে না, ববং তাহা প্রধানতঃ স্থানীয় অবস্থা-জাত বলিয়াই মনে

হইবে। একান্ত সাধারণ মানবিক বৃত্তিগুলি উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তি হইতে পারে, কিন্তু সেইজন্য তাহা একান্তভাবে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের ভিত্তি এ কথা হয়ত কোন নৃতত্ত্ববিদই দাবী করিবেন না। কারণ, সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানে মানুষকে তাহার পটভূমিকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয় না, অতএব এই পটভূমিকার কথা যেখানে আছে, সেখানে দেশ-কাল নিরপেক্ষ মানুষের কথা উঠিতেই পারে না। অতএব যত গভীরভাবেই হউক, বিচ্ছিন্নভাবে মানুষকে প্রত্যক্ষ করিয়া সমগ্রভাবে তাহার সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে কোন সাধারণ সংজ্ঞা রচনা করা যায় না।

পাশ্চাত্ত্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ religion কথাটির যে সকল সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও একটি বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে 'রিলিজিয়নে'র সঙ্গে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, 'অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাসের নামই রিলিজিয়ন।' যেমন আর্যগণ সূর্যকে পূজা করিতেন, সূর্যকে প্রাকৃত বস্তু ভাবিয়া নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সূর্যের মধ্যে যে অপ্রত্যক্ষ কোন শক্তি আছে, তাহার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া। এই বিশ্বাস যদি না থাকিত, তবে সূর্যের স্তবগান করিয়া তাহার মন্ত্র রচিত হইত না। স্তবগানের অর্থই হইতেছে অতিপ্রাকৃত গুণের বন্দনা। মন্ত্র শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য যে মন্ত্রোচ্চারকের জন্য অতি-প্রাকৃত উপায়ে কিছু করিতে পারে, এই বিশ্বাসই আর্যগণের সূর্যোপাসনার মূল। অতএব এই অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস হইতে সূর্যপূজার উদ্ভব হইয়াছে। পূজা ধর্মের একটি বহিরঙ্গ। রিলিজিয়নের এই সংজ্ঞাই যদি গ্রহণ করিতে হয়, তবে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, মানব নামক জীব পশুত্বের মধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মানব বৈশিষ্ট্য লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাহার মধ্যে এই অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব বিষয়ে ধারণা জন্মিয়াছিল? যদি তাহা না হয়, তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব-সভ্যতার কোন অবস্থায় 'রিলিজিয়নে'র জন্ম হইয়াছিল? অবশ্য এ' কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, জড়জীবের যে প্রাণশক্তি থাকিতে পারে, তাহা অনিষ্ট করিবার শক্তিই হউক কিংবা ইষ্ট করিবার শক্তিই হউক, এই ধারণা মানব সভ্যতার নিতান্ত শৈশবাবস্থায় মানব-মনে উদ্ভূত হয় নাই। প্রকৃতির মধ্যে আত্মার অস্তিত্বের পরিকল্পনা সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিশেষ এক স্তরে

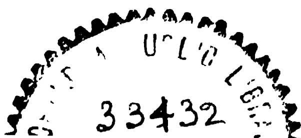
উদ্ভূত হইয়াছিল। এই বিষয়ে কাহারও কোনও সন্দেহের অবকাশ আছে কি না জানি না, তথাপি বিষয়টি আরও একটু বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে মৃত্যু কিংবা নিদ্রা হইতেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ আত্মা নামক এক অতিপ্রাকৃত বস্তুর অস্তিত্বের সন্ধান পাইয়াছিল। জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য কি? একজনের মধ্যে কিসের অভাব তাহাকে জড়ের মত নিশ্চল করিল, আর একজনের মধ্যে কিসের অস্তিত্ব তাহার ব্যতিক্রম করিল? গুহাবাসী মানুষ একদিন এই কথাই ভাবিতে গিয়া এক অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিল। এই অদৃশ্য শক্তিই আত্মা। প্রাগৈতিহাসিক সমাজ তখনও জীব ও জড়ের পার্থক্য বুঝিত না, অতএব জীবের মধ্যে সে যে আত্মার সন্ধান পাইল, জড়ের মধ্যেও সে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিল। এই ভাবেই প্রথম animatism বা সর্বপ্রাণবাদের জন্ম হইল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইহাই ধর্মের প্রথম উন্মেষ। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসের বিশেষ একটি স্তরে আদিম মানব জাতির মনে এই সর্বপ্রাণবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। যদি ইহা হইতেই 'রিলিজিয়নে'র যাত্রা সুরু হইয়া থাকে, তবে ইহার পূর্ববর্তী অবস্থার মানব-সমাজ সম্পূর্ণই রিলিজিয়নের সম্পর্কশূন্য ছিল। অতএব যাহারা বলিয়া থাকেন যে, 'রিলিজিয়ন' ব্যতীত কোন মানবেরই অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তাহাদের উক্তি সমর্থন করা যায় না। তবে সভ্যতার কোন স্তরে যে মানবের মধ্যে এই সর্বপ্রাণবাদের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। এখানে আরও একটি কথা আছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পরস্পর অতি দূরবর্তী স্থানে বাস করা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন প্রকৃতির মানব জাতির মধ্যে এই সর্বপ্রাণবাদের অস্তিত্ব দেখিয়া কতকগুলি প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক। প্রথমতঃ এই ধারণা তাহারা পরস্পর স্বাধীন ভাবেই নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছে কি না। দ্বিতীয়তঃ যদি তাহা না হয়, তবে কোন জাতির মধ্যে কোথায় এই ধারণার সর্বপ্রথম উদ্ভব হইল এবং কি ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী অন্যান্য জাতিও এই মতবাদে দীক্ষা লাভ করিল। তৃতীয়তঃ এমনও মনে হইতে পারে কি যে যখন আদিম সমাজের মধ্যে এই ধারণার উদ্ভব হয় তখন পৃথিবীর সমগ্র

মানবই এক জাতি ও এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং কালক্রমে তাহারা বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া পরস্পর হইতে বাহ্যতঃ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র অনুমান ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কোন প্রশ্নেরই জবাব দেওয়া সম্ভব নহে। কারণ, ইহাদের কোন বিষয়েই কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, মানুষের মধ্যে যে কতকগুলি সাধারণ বৃত্তি আছে, তাহাদের উপরই নির্ভর করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই ধারণার স্বতন্ত্রভাবেই জন্ম হইয়াছিল। কোন জাতি অপর কোন জাতি দ্বারা এই বিষয়ে প্রভাবান্বিত হয় নাই।

কিন্তু 'রিলিজিয়ন' সম্পর্কিত প্রাথমিক কতকগুলি বিশ্বাস জন্মলাভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ এক গোষ্ঠিভুক্ত হইয়া একত্র বাস করিয়াছিল এবং সেই সূত্রেই এই সম্পর্কে তাহারা কতকগুলি সাধারণ বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছে এ কথাও যদি কেহ কেহ খুব জোর দিয়া বলিতে চাহেন, তবে তাহার বিরুদ্ধেও বিশেষ কোন যুক্তি দেখাইতে পারা যায় না। কারণ, 'রিলিজিয়ন' সম্পর্কিত এমন অনেকগুলি খুঁটি নাটি বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী বিভিন্ন মানব জাতির মধ্যে এমন কতকগুলি বহিরঙ্গগত ঐক্য দেখিতে পাওযা যায় যে, তাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রচিত হইয়াছে বলিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে না। পৃথিবীর সমগ্র মানব যদি এক আদিম দম্পতির বংশধর হইয়া থাকে, তবে তাহারা একদিন এক সমাজভুক্ত হইয়া একত্র বাস করিয়াছিল, এমন অনুমান করা একেবারে অসঙ্গত হইতে পারে না।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের নাম অন্ধকার যুগ। ইহার মধ্যে আলোকসম্পাত করিবার মত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে এই সম্পর্কিত এত মতবিরোধ দেখা যায় যে অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গেই এই বিষয়ে তাহার তুলনা হয় না। কবে মানব বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া ধরণীর ধূলিমাটির উপর তাহার প্রথম চরণ চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল, কতদিন কি ভাবে বাস করার পর কি অবস্থার ভিতর হইতে তাহার মধ্যে প্রথম ধর্মভাবের অরুণোদয় হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সেই প্রথম ধর্মভাবোন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে কি ভাষায় কোন আদি গায়ত্রী কোন দেবতাকে বন্দনা করিয়া সর্বপ্রথম



উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা আজ কেহ কল্পনা করিয়াও বলিতে পারিবে না। তথাপি পণ্ডিতগণের এই বিষয়ে স্বাভাবিক কৌতূহলেরও অন্ত নাই। এই কৌতূহল প্রবৃত্তি হইতেই বিবর্তনবাদ, ক্রমাবনতিবাদ প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই সকল মতবাদ দ্বারা নির্ভুল সত্যের সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কি না, তাহাই কে বলিবে? কারণ, তাহা প্রমাণ কবিবার মত উপাদানে সমূহও সহস্র সহস্র বৎসবের মৃত্তিকাতলে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে; অতএব এই বিষযে অনুমানই আমাদের একমাত্র সহায।

বিবর্তনবাদের মত অধুনা প্রায সর্ববাদী সম্মত মতবাদই যদি গ্রহণ করা যায, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সভ্যতাব বিকাশের বিশেষ এক অবস্থায আদি সমাজের মনে আত্মাব অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধাবণা জন্মিযাছিল; এই আত্মাব ধাবণা হইতেই পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞানুযাযী 'বিলিজিযনে'ব জন্ম হইযাছে। আত্মাব মত নিবয়বব কোন ভাবসাব বস্তুব পবিকল্পনা ও জড়পদার্থে ইহাব প্রযোগ কবিবাব মত মানসিক দৃষ্টি যে কতকটা অগ্রসব সমাজ ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমান কবা যাইতে পাবে। তাহা হইলে মানব-মনে আত্মা সম্পর্কিত ধাবণা জন্ম লাভ কবিবার পূর্বে সমাজে 'বিলিজিযনে'ব অস্তিত্ব ছিল না, তাহাই বা কি ভাবে স্বীকাব কবা যায? অতএব মনে হয, সুস্পষ্টভাবে আত্মা বিষযক ধাবণা সৃষ্টি হইবার পূর্বে আদি সমাজেব মধ্যে আত্মাব প্রায অনুরূপ কোন ধাবণাব অস্তিত্ব ছিল, তাহাই কালক্রমে আত্মা বলিযা পবিচিত হইযাছে। অর্থাৎ সর্বপ্রাণবাদ বা animatism অবস্থাবও পূববর্তী একটি অবস্থা ছিল, তাহাব মধ্যে সম্ভবত: জড জীবেব মধ্যেও একটি কার্যকবী শক্তিব অস্তিত্ব স্বীকাব করা হইত, ইহা তখনও জডেব প্রাণ বা আত্মা বলিযা সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট হয নাই। ইহা কেবল মাত্র একটি শক্তি। মানবের বাহুতে যে শক্তি আছে, বাতাসের মধ্যে যেমন শক্তি আছে, নদীস্রোতেব মধ্যে, সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে যেমন প্রত্যক্ষ শক্তিব অস্তিত্ব আছে, ইহাও তেমনই। সমগ্র জড ও জীবের মধ্যেই এই প্রকাব একটি অদৃশ্য পবিকল্পনা লইযা আদিম সমাজে সর্ব প্রথম আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হইয়াছিল। এই শক্তিকে তখনও সুস্পষ্ট ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবের আত্মার সঙ্গে এক করিয়া দেখা হইত না। একটি

প্রস্তর খণ্ডকে গড়াইয়া দিলে সেও ক্ষুদ্রতর প্রস্তর খণ্ডকে ভাঙ্গিয়া দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে ; গড়াইয়া চলিবার শক্তি ও ক্ষুদ্রতর প্রস্তর খণ্ডগুলিকে ভাঙ্গিবার তাহার যে শক্তি, তাহা তাহার মধ্যে কল্পিত আত্মা হইতে পৃথক্। জড়ের এই প্রকার প্রত্যক্ষ শক্তি লক্ষ্য করিয়াই পরবর্তী কালে ইহার আত্মার পরিকল্পনা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের মেলানেসিয়া ও পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে যে আদিম জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে 'মন' (mana) নামক একপ্রকার শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা আছে। জড়ের কল্পিত শক্তি মাত্রই অবশ্য এই 'মনে'র অন্তর্গত নহে ; যেখানে শক্তি বা ক্ষমতার উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই 'মনে'র অস্তিত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে। তাহাদের মতে এই 'মন' যে কোন বস্তু বা জীবের মধ্যেই থাকিতে পারে, 'মনে'র অধিকারী জীব 'মন'-হীন জীব হইতে বলবান্, মনের অধিকারী যে বস্তু, তাহা 'মন'-হীন বস্তু অপেক্ষা উন্নততর। এই 'মন'ও একটি শক্তি এবং ইহা স্পষ্টতই আত্মা হইতে স্বতন্ত্র ; তবে ইহা একটি উন্নততর শক্তি, সেইজন্য ইহার অধিকারী হইলে জীব বা জড় উন্নততর গুণের অধিকারী হইতে পারে। অতএব এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, ইহা একটি উন্নততর শক্তি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আদিম জাতির মধ্যে জড় কিংবা জীবে আত্মা-নিরপেক্ষ এক শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান ছিল। আমি আদিম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদের (animatism) পূর্ববর্তী যে শক্তি সম্পর্কিত ধারণার অস্তিত্বের অনুমান করিয়াছি, তাহার সঙ্গে এই 'মন' শক্তির কেবল মাত্র গুণগত পার্থক্য রহিয়াছে, আর কোন পার্থক্য নাই। অতএব আমার মনে হয়, আদিম সমাজ জীবের আত্মা-সম্পর্কিত কোন ধারণা লাভ করিবার পূর্বে জড়ের মধ্যে এক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিল—এই ধারণারই একটি উন্নততর সংস্করণ মেলানেসিয় ও পলিনেসিয় জাতির মধ্যে 'মন' শক্তির রূপে এখনও আত্মরক্ষা করিয়া আছে। কারণ, এ'কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, উন্নত, অনুন্নত কথাগুলি আপেক্ষিক। অনুন্নত অবস্থা হইতেই উন্নত অবস্থার পরিকল্পনা হইয়া থাকে। অতএব মেলানেসিয় ও পলিনেসিয়গণ যখন উন্নততর জড় ও জীবে এক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে, তখন অনুন্নত জড় ও জীব জগতও তাহার অস্তিত্বের সম্ভাবনা হইতে বাদ যায় না। অবশ্য

তাহা উন্নততর কোন গুণের মূল না হইতে পারে, তথাপি তাহাও যে নিম্নস্তরের হইলেও একটি শক্তি তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ আজ যাহা উন্নত বলিয়া গৃহীত হইতেছে, কাল তাহা অনুন্নতের পর্যায়ে নামিয়া যাইতে পারে এবং এই উপায়ে আজ যাহা অনুন্নত আছে, তাহাও কাল উন্নত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বিশেষতঃ অনুন্নত অবস্থা হইতেই উন্নত অবস্থার কল্পনা হইয়া থাকে। অনুন্নত এবং উন্নত অবস্থার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা অনেক সময়ই অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্যই উন্নততর বস্তু বা জীবে যদি 'মনে'র অস্তিত্ব কল্পনা করি, তাহা হইলে অনুন্নত বস্তু বা জীবের মধ্যেও তাহার আভাস দেখিতে পাই। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, সর্বপ্রাণবাদেরও (animatism) পূর্ববর্তী একটি অবস্থা ছিল, তাহা মেলানেসিয ও পলিনেসিয উপজাতির মধ্যে 'মনে'র পরিকল্পনায আংশিকভাবে রক্ষা পাইয়া থাকিবে, কিন্তু সম্পূর্ণ যে রক্ষা পায নাই, তাহা সত্য। তাহা হইলে ইহার যে পূর্ণতর কোন পরিচয ছিল, তাহা এই 'মন' পরিকল্পনার পূর্ববর্তী। আলোচনার সুবিধার জন্য তাহাকে প্রাঙ্‌মনবাদ (Pre-manism) সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। আদিম সমাজ জীবাত্মার অনুভূতি লাভ করিবার পূর্বে বিশ্বের অণু পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বস্তুর মধ্যে যে এক প্রত্যক্ষ শক্তির লীলা দেখিতে পাইযাছিল, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ এই প্রাঙ্‌মনবাদের পরিকল্পনা করিয়াছিল। এই শক্তি কোন বস্তুকে আশ্রয করিযা একান্ত হইযা থাকিতে পারে বলিয়া মনে করা হয নাই, তাহা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিযা মনে করা হইত। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নাই; ইহা অত্যন্ত সহজ ও সরল,—নদীজল স্থির নহে, তাহা স্রোতোবেগে উদ্দাম হইযা চলে, বিরাট বনস্পতি বাতাসে সর্বদা আন্দোলিত হয়, বজ্র-পাতে পর্বত শৃঙ্গ ভাঙ্গিযা পড়ে, পৃথিবীর ধূলি বাতাসের বেগে আকাশে উড়িয়া যায়,—আকাশের মেঘ সর্বদা ঘুরিযা বেড়ায—প্রকৃতির কোন বস্তুই স্থির নহে। তখন সবেমাত্র মানবের মনে প্রকৃতি সম্বন্ধে এক রহস্য-বোধ জন্মিয়াছে। প্রকৃতির এই রহস্য-বোধ হইতেই এই 'প্রাঙ্‌মনবাদের' সৃষ্টি হইয়া থাকিবে—সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহাতে শক্তিকে এক

জায়গাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রত্যক্ষ করা হয় না, শক্তি এখানে সর্বাশ্রয়ী, অথচ কোন বস্তুতে খণ্ডিত নহে। মনে হয়, মানবমনের এমনই কোন অস্পষ্ট ধারণা হইতে পরবর্তী কালে আত্মার পরিকল্পনা হইয়াছিল। নতুবা আত্মার মত সুপরিণত কোন পরিকল্পনা সহসা একদিন মানব-মনে উদয় হইতে পারে না। অতএব সর্বপ্রাণবাদ (animatism) কিংবা জড়াত্মবাদ (animism) হইতেই যে সর্বপ্রথম 'রিলিজিয়নে'র জন্ম হইয়াছে, তাহা স্বীকার করা যায় না।

ধর্মে 'রিলিজিয়নে'র উৎপত্তি নির্ণয় করা যে রকম কঠিন, তাহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা তেমনই কঠিন ; কারণ, কোন নৃতত্ত্ববিদ্ই সম্পূর্ণ আত্মনিরপেক্ষ হইয়া যে অপর কোন জাতি বিশেষতঃ তথাকথিত আদিম জাতির ধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাহা নহে। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা এ' কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই খৃষ্টধর্ম প্রচারকারী। ধর্ম সম্বন্ধে যে তাহারা একেবারে নির্লিপ্ত তাহা নহে, বরং বিশেষ একটি ধর্মের প্রতি তাহাদের মমত্ব বোধ আছে। বিশেষ ধর্মের প্রতি এই মমত্ববোধের জন্য 'অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন' অন্য একটি অনগ্রসর জাতি সম্বন্ধে তাহাদের নিকট হইতে প্রকৃত নিরপেক্ষ সত্যের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এইজন্য খৃষ্টধর্ম প্রচারকারীদিগের দ্বারা রচিত আদিম জাতির ধর্মবিষয়ক আলোচনা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হইতে পারে না। এই ধর্মপ্রচারকারী ব্যতীত আর এক শ্রেণীর তত্ত্বানুসন্ধিৎসু এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে ; অতএব যাঁহারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিজেদের মতবাদ গঠন করিয়া থাকেন, তাঁহারা 'রিলিজিয়ন' সংক্রান্ত বহু খুঁটিনাটি ব্যাপারের তাৎপর্য বুঝিতে পারিবেন না। কেবল মাত্র উপজাতি সম্পর্কিত বিস্তৃত ও গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারাই এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না—এই বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য একটি সহজাত অনুভূতিরও প্রয়োজন। ধর্মের ক্রিয়া অধিকাংশই ইঙ্গিতমূলক, অনেক সময় ইহাদের মূল তাৎপর্য ধর্মাশ্রিত ব্যক্তিগণ নিজেরা পর্যন্ত ভুলিয়া যায় ; এই অবস্থায় বৈদেশিক কোন ব্যক্তির স্বতন্ত্র সংস্কারের অধিকারী হইয়া দূর হইতে বহিরঙ্গগত কতকগুলি আচার

বিচ্ছিন্ন ভাবে মাত্র লক্ষ্য করিযা ইহাব সম্বন্ধে প্রকৃত কোন জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে ; যে জ্ঞান লাভ হইযা থাকে, তাহা নিতান্তই আংশিক মাত্র। অতএব ইহাদের মধ্য হইতে কোন উপজাতির ধর্ম সম্পর্কেই কোন পুর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওযা যায না। এইজন্যই ইহাদেব তাৎপর্য ব্যাখ্যাও অনেক সময লেখকেরই স্বকপোলকল্পিত হইযা থাকে। উপজাতির মধ্যে গবেষণা-মূলক কোন কাজ করিতে হইলে প্রথমেই সেই জাতিব নিজস্ব ভাষা শিক্ষা করিযা লওযা প্রযোজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদকেব মধ্যস্থতায এই কার্য কবা হয। নৃতত্ত্ববিষযক গবেষণাব কার্যে আমাব সামান্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই অনুবাদক দ্বাবা এমন মাবাত্মক ভাবে মধ্যে মধ্যে প্রতাবিত হইযাছি, যে তাহা প্রকাশ কবিযা বলিবাব নহে। অতএব অনুবাদকেব সাহায্যে গবেষণা কার্য পবিচালনা কবাব সনাতন বীতি এখন পবিত্যাগ কবিবাব সময আসিযাছে। যাঁহাবা এই উপাযে উপজাতিব মধ্য হইতে তথ্য সংগ্রহ কবিযা সামাজিক নৃতত্ত্বমূলক পুস্তক বচনা কবিযাছেন তাঁহাদেব প্রদত্ত তথ্য অত্যন্ত সাবধানতাব সঙ্গে গ্রহণ করা প্রযোজন।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ যখন কোন উপজাতিব মধ্যে কোন বিষযে তথ্য সংগ্রহ কবিতে যান, তখন তাঁহাদেব নিজেদেব মধ্যে একটি superiorityব ভাব আসিযা যায। এই ভাবটি সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন না দিতে পাবিলে নৃতত্ত্ববিষযক কোন তথ্যই যথার্থ সংগৃহীত হইতে পাবে না। কোন মানুষ হইতে কোন মানুষ বড নহে,— শুধু পাবিপার্শ্বিক অবস্থায একজনকে এক প্রকাব ও আব একজনকে অন্যপ্রকাব কবিযাছে, এখানে ছোট বড'ব কোন প্রশ্নই আসে না। চিবন্তন সভ্যতাব আদর্শ স্থিব কবিযা দিযা কে 'ছোট' এবং 'বড'ব মান নিরূপণ কবিতে পাবে ? এই সহজ সত্যটি আমবা সর্বদাই বিস্মৃত হই। সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ না ঘটাইতে পাবিলে আমা হইতে স্বতন্ত্র যে আবও মানুষ আছে, তাহাকে চিনিতে পারা যায না। এই আত্মবিলোপ কবা সম্ভব হয না বলিযাই আমি অন্য মানুষকে চিনিতে পাবি না। আব একটা কথা এই যে, সম্পূর্ণ অপবিচিত বৈদেশিক কোন ব্যক্তি নৃতত্ত্ববিদ রূপে যদি কোন উপজাতিব মধ্যে গিযা উপস্থিত হন, তবে সেই উপজাতীয অধিবাসীদিগের মধ্যে অলক্ষ্যে একটা আত্মসচেতনতার ভাবও

আসিয়া যায়। সেইজন্য অনেক সময় তাহাদের মধ্যেও কোন বিষয়কে বাড়াইয়া বলিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। অতএব প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে অনেক সময় বাধা দেখা দেয়। অথচ কয়জন নৃতত্ত্ববিদ্ এই বিষয়ে অবহিত হইয়া কাজ করিতে পারেন? এই সকল কারণে বলিতেছিলাম যে, উপজাতির ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কেও অনেক সময় আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না।

উপজাতীয়ের ধর্ম সম্বন্ধে এক কথা ভুলিলে কখনই চলিবে না যে, ইহা দৃশ্যতঃ যত সরল বলিয়া মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। অনেকে এখনও মনে করিতে পারেন যে, উপজাতীয় লোকদিগের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে 'রিলিজিয়ন' বলিয়া কিছু নাই। ইহা অত্যন্ত ভুল। 'রিলিজিয়নে'র সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন, আচার যদি তাহার একটী বহিরঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়, তবে দেখা যায় যে কোন কোন উপজাতীয় অধিবাসীর মত এত জটিল আচার-জীবন তথাকথিত অনেক সভ্য জাতির ধর্মেও নাই। অতএব তাহাদের ধর্ম বিষয়ক আলোচনাও সেই অনুপাতেই জটিল হইতে বাধ্য। উন্নততর জাতির ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় যে সুবিধাটুকু আছে, তাহা উপজাতীয়ের ধর্ম সম্পর্কে পাওয়া যায় না। কারণ, উচ্চতর জাতির ধর্মবিধি একটি নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া অগ্রসর হয় এবং সেই নির্দিষ্ট পথটি খুঁজিয়া পাওয়া একেবারেই কঠিন নহে। অধিকাংশ সময়ই তাহা লিখিতই পাওয়া যায়। সেইজন্য ম্যাক্সমূলর ভারতবর্ষে পদার্পণ না করিয়াও 'Sacred Book of the Hindus' নামক হিন্দুধর্ম বিষয়ক বিরাট ও তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বেদ-পুরাণ-স্মৃতি—ইহাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের অধ্যাত্ম ও আচার জীবন সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মূলতঃ তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াই হিন্দুর আধ্যাত্মিক ও আচার জীবনও গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উপজাতীয়ের ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় এই প্রকার কোন সুবিধাই পাওয়া যায় না। তাহাদের আধ্যাত্মিক (spiritual) কিংবা আচার জীবন কোন নির্দিষ্ট পথ ধরিয়াও অগ্রসর হয় না। নানা জাতির সংস্পর্শে আসিবার ফলে বিশৃঙ্খল ভাবে যে সকল উপাদান তাহারা সঞ্চয় করিয়া চলিতেছে, তাহা বিশৃঙ্খল ভাবেই তাহারা তাহাদের জীবনে ব্যবহার করিতেছে। এক বিষয়ে কোন একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিবার পূর্বেই তাহারা তাহার উপর বিশ্বাস হারাইয়া অন্য পথ অবলম্বন করে,

নতুবা পরের অনুকরণে নূতন পন্থায় অগ্রসর হয়। ইহারা ধর্মের কোন সুনির্দিষ্ট বিধি গড়িয়া তুলে না বলিয়াই অন্যান্য ধর্ম হইতে নূতন উপাদান গ্রহণ করিতে তাহাদের পক্ষে কোন বাধা থাকে না। একবার কোন উপায়ে কোন উপকরণ আসিয়া কোন ধর্মের আচারভুক্ত হইয়া পড়িলে তাহা আর পরিত্যাগ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। এই ভাবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও নূতনতর উপকরণে তাহাদের আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে। নিষাদ জাতি কবে কোন পথে কি ভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস নাই। এমনও হইতে পারে যে তাহারাই এই দেশের আদিম অধিবাসী। কিন্তু এই সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত রূপে বলিতে পারা যায় না। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে এমন কোনও নিদর্শন আজিও পাওয়া যায় নাই যাহা দ্বারা অন্ততঃ অনুমান করিয়াও বলিতে পারা যায় যে এদেশে এত সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে মনুষ্য বসতি আরম্ভ হইয়াছে। অতএব এই বিষয়ের আলোচনার ভিত্তিই একমাত্র অনুমান, অবশ্য পারিপার্শ্বিক অন্যান্য সকল অবস্থা বিচার করিযাই অনুমান করা হইযা থাকে, সুতরাং অনেক সময় এই অনুমানও নির্ভরযোগ্য হইতে পারে।

নিষাদ বা আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) যদি ভারতবর্ষের বাহির হইতেই আসিযা থাকে তবে তাহাদের বর্তমান ধর্ম সংস্কৃতির মধ্যে তাহারা যে দেশ হইতে আসিয়াছে, যে দেশের উপর দিযা আসিয়াছে এবং যে দেশে আসিযা স্মরণাতীত কাল হইতে বসবাস করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেক দেশেরই উপাদান মিশ্রিত হইযা ইহাকে এক অতি জটিল বিষয়ে পরিণত করিবে। ধর্ম ও আচারের উপাদান সহজে পরিত্যক্ত হয না : কুসংস্কারের ইতিহাসই তাহাই। একদিন যে আচারের হযত বিশেষ একটি বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ছিল, আজ তাহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয হইয়া পডিলেও আচারের গণ্ডী হইতে তাহা বিসর্জিত হয় না। কারণ, কে জানে ইহাকে পরিত্যাগ করিবার ফলে পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনে কি আপৎ দেখা দেয় : অতএব ইহাকে রক্ষা করাই ভাল। ইহার নাম রক্ষণশীলতা। একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আলোচিত নিষাদ জাতির মধ্যে যে সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে সমুদ্র, সামুদ্রিক জীব কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদিরই আধিপত্য দেখিতে পাওয়া

যায়। ইহা হইতে মনে হইবে, ইহারা কোন কালে সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের অধিবাসী ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহারা পশ্চিম উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের যে সকল দুর্গম অরণ্যাঞ্চলে বসবাস করে, তাহার মধ্যে তাহাদের সমুদ্র ও সামুদ্রিক জীবের পরিবর্তে পর্বত ও অরণ্যের সম্পর্কই বেশী। কিন্তু তাহাদের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী পর্বত ও অরণ্যের ছায়ায় নূতন সংস্কার লাভ করিতে পারে নাই—বহু শতাব্দী প্রাচীন সংস্কারের বিলুপ্ত স্মৃতি-পথের ক্ষীণ-রেখা ধরিয়া তাহা পিছনের দিকেই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণেই আদিম জাতির ধর্মবিষয়ক আলোচনা এত জটিল হইয়া পড়ে।

নিষাদ জাতির পরিচিত গণ্ডীর বাহিরেও তাহাদের কৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য মন্‌খেমর্ ভাষা। এই ভাষা মূলতঃ নিষাদ জাতির ভাষা বলিয়া গণ্য হইলেও ইহা বর্তমানে তাহাদের অধ্যুষিত অঞ্চলের বহু দূরবর্তী স্থান আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্বতের কিরাত বা মোঙ্গলয়েড্ জাতির এক শাখার মধ্যে মাতৃভাষা রূপে ব্যবহার হইতে দেখা যায়। কিরাত জাতির এই শাখা কেবলমাত্র ভাষার জন্যই কি নিষাদ জাতির নিকট ঋণী, না ইহার কৃষ্টির অন্যান্য উপকরণের মধ্যে সন্ধান করিলে নিষাদ জাতির নিকট তাহার আরও ঋণ ধরা পড়িবে? হয়ত তাহাই হইবে; কারণ, নিবিড়তম সামাজিক সম্পর্ক ব্যতীত একের ভাষা অন্যের উপর কখনও প্রভাব স্থাপন করিতে পারে না। কিংবা ঐ কথাই বা কি করিয়া বলা যায় যে, যে নিবিড় সামাজিক সম্পর্কের ফলে নিষাদের ভাষা কিরাত জাতির এক শাখার মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কের ফলেই কিরাত সভ্যতার কোন কোন উপকরণও নিষাদের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করে নাই? কারণ, আদান প্রদানই সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের অবশ্যম্ভাবী ফল। একমাত্র প্রদান কিংবা একমাত্র আদান কোন কালেই কোন দুই জাতির সম্পর্কের মধ্যেই সম্ভব হয় নাই। প্রাচীন গ্রীসের মত বিশ্ববিজয়ী জাতি পরাজিত ভারতের নিকট হইতেও কৃষ্টিগত বহু সম্পদ সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজস্ব জাতীয় সভ্যতাকে সমৃদ্ধতর করিয়াছিল। অতএব কোন্ জাতির মধ্যে কোন্ উপাদান কি ভাবে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কেহ কোনদিন স্থির করিয়া বলিতে পারিবে না।

ভূমিকা

নিষাদ জাতিও প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ভারতে বাস করিবার ফলে বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যেমন বহু খুঁটিনাটী সম্পদ দান করিযাছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, আবার তেমনই সেও ভারতের বিভিন্ন জাতির নিকট হইতে বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার বহু উপকরণ নিজেও লাভ করিযাছে বলিযা অনুমান করা যায়। এই বিষয়ে কাহার দানের কি পরিমাণ তাহার চুলচেরা হিসাব করা যেমন অসম্ভব তেমনই অপ্রয়োজনীয়। কারণ, বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা বিভিন্ন জাতির সমবেত সাধনার এক অখণ্ড ফল, একের দাবী সেখানে গ্রাহ্য নহে।

বাংলাদেশেব চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়িযা আজ পর্যন্তও যে আদিম জাতি সমূহ তাহাদের আদিম জীবনের ধাবা বহুলাংশে অক্ষুন্ন রাখিযা চলিযাছে, তাহাদের পূর্বপুরুষ যে একদিন বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিল, তাহা বুঝিতে পাবা যায়। প্রবলতর জাতির আক্রমণের ফলেই তাহারা বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলেব অরণ্য এবং পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিযাছে। কিন্তু প্রবলতর জাতির সম্মুখীন হইযা পূর্ববর্তী অধিবাসিগণ যদি এ'দেশের সমতল ভূমিব উপর সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিযা সমগ্রভাবে গিয়া পর্বত ও অবণ্যে আশ্রয় লইত, তবে বাংলার লোক-সংস্কৃতির মধ্যে এত বৈচিত্র্য দেখা যাইত না। ইহার কাবণ এই যে, ইহাদের এক প্রধান অংশ সমতল ভূমিব উপবই বহিযা গিযাছে, এবং তাহাদের ধর্ম, আচার, জীবনাচরণ ও সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারা বিজিত জাতির জীবনকে নানা-ভাবে পরিপুষ্ট কবিযাছে। বিশেষতঃ পণ্ডিতগণ অনুমান করিযাছেন, বাংলাদেশের বর্তমান জন-গোষ্ঠী যে সকল প্রবল জাতির ভিত্তির উপর স্থাপিত হইযাছে, তাহাদেব মধ্যে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র ও পশ্চিম বাংলার বাগ্‌দী জাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার ডোম জাতিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল জাতি বর্তমানে হিন্দুধর্মের বহিঃশক্তিব ক্রমাগত প্রভাবের ফলে বাহির হইতে হিন্দু ধর্ম ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাব অন্তর্গত বাংলাভাষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইহাদের মৌলিক জীবনধাবাব কোন কোন ক্ষেত্রে যে এখনও পূর্ববর্তী সংস্কারের প্রভাব অনুভব করিয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইজন্য একই

বাংলাদেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিম অধিবাসীর বিচিত্র জীবনোপকরণের কিছু কিছু পরিচয় বাংলার জন-জীবনে এখনও প্রচ্ছন্ন হইযা আছে। কোন কোন স্থানে ইহারা কিছু মার্জিত হইয়া সামান্য নূতন রূপ লাভ করিয়াছে, কিন্তু অধি গংশ ক্ষেত্রই এখনও ইহাদের পয়িচয় একেবারে লুপ্ত হইযা যাইতে পারে নাই। বাংলার লোক-শ্রুতিতে আজিও তাহা বহুলাংশে রক্ষা পাইয়াছে। বাংলার মৌলিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যদি আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি, তবে আজিও তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

সংগ্রহ ও বিচার

জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের মত লোক-সংস্কৃতিও যে অনুশীলন এবং অধ্যয়নের বিষয়, তাহা আজ পর্য্যন্তও যে আমরা সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, এ' কথা সত্য। লোক-সাহিত্যের কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যায়, আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সাহিত্যের যে সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্বতোভাবেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত লিখিত সাহিত্যকেই অবলম্বন করিয়াছে, এ জাতির ঐতিহ্য ইহাতে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। অথচ এই বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষাকেই আমরা রেনেসাঁ বা জাতীয় নবজাগরণ বলিয়া অভিনন্দন করিয়া লইয়াছিলাম। প্রত্যেক দেশেই লোক-সাহিত্যের ভিত্তির উপরই লিখিত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। যদিও লিখিত সাহিত্যধারা সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মৌখিক প্রচলিত লোক-সাহিত্যের ধারাটি ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে, তথাপি বহুকাল পর্যন্ত তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু এ' কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, লিখিত সাহিত্য জাতির লোক-সাহিত্য হইতেই তাহার প্রাণ-শক্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু বাংলা দেশে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাঙ্গালীর তথাকথিত নব-জাগরণ দেখা দিল, তখন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের ধারা প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনই প্রধানতঃ এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিল। জীবন-ধারা একটি নির্দিষ্ট স্রোতে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া প্রবাহিত হইবার পর তাহা যখন নানা কারণে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই আদর্শচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতির সম্মুখে এমন একটি শক্তিশালী আদর্শ আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল যে স্বভাবতঃই জাতি পশ্চাতের দিকে আর কোন প্রকার লক্ষ্য না করিয়া একান্ত ভাবে তাহাই নিবিড় ভাবে আশ্রয় করিল। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা হইতে ইহার বিচ্যুতি এই কারণেই প্রধানতঃ আসিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই শ্রেণীর জাতীয় আত্মবিস্মৃতি তাহাদের কোন কালেই ঘটে নাই। প্রত্যেক জাতিরই নব-জাগরণের শক্তি

আসিয়াছে জাতির অন্তরের প্রেরণা হইতে, বাহিরের প্রেরণা হইতে নহে। সেই জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নব-জাগরণের প্রকৃতির সঙ্গে বাংলা দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর এই তথাকথিত নব-জাগরণের সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করা যায়। সেই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডে সাহিত্যচিন্তা ও তাহার সৃষ্টির ভিতর দিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে যে জাতীয় নব-জাগরণের সূচনা দেখা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের ইংরেজ চারণ কবি চসার ও জন্ গাওয়ার প্রভৃতির রচনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় নাই। এমন কি রেনেসাঁ যুগের প্রথম ভাগ ব্যাপিয়া ইহাদের উপকরণই নানা ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। এমন কি, রেনাসাঁ যুগের অন্তর্ভুক্ত সেক্সপীযরের মত ব্যক্তিও ইংরেজ জীবনের বিচিত্র ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার সাহিত্য-সৌধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নব-জাগরণের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে মধ্যযুগের সাহিত্য-ধারার মত এত শক্তিশালী একটি ঐতিহ্যেরও কোনই স্থান ছিল না। সুতরাং সেদিন জাতিকে বাদ দিয়া 'জাতীয় জাগরণ' এবং দেশকে বাদ দিয়াই দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হইযাছিল। সেই জন্য জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া সে দিন বাঙ্গালীর রস-সংস্কারের মধ্যে যাহা কোন রকমে তখনও আত্মরক্ষা করিয়া ছিল, তাহা এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর সম্মুখে সম্পূর্ণ অবহেলিত ও অবজ্ঞাত হইয়া পড়িল।

কিন্তু যে জাতির আত্মমর্যাদা বোধ এত প্রবল, তাহার মধ্যে আত্ম-বিস্মৃতির ভাব যে কারণেই সাময়িকভাবে সৃষ্টি হউক না কেন, তাহা দীর্ঘ কাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না—এ' দেশেও তাহা পারিল না। পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের একান্ত আনুগত্যের ভিতর দিয়াই ক্রমে ইহার মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নানাভাবেই ইহার সূচনা দেখা দিয়াছিল, তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই স্বদেশী আন্দোলনের আবির্ভাবের ভিতর দিয়া ইহার কর্মকাণ্ড যথার্থ সুরু হইল। এই যুগেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের অন্ধ আনুগত্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস জীবনে স্বীকার করিয়া লইল। তাহার ফলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রথম মোহ কাটিয়া গিয়া স্বদেশের কেবল মাত্র স্বাধীনতা নহে, ইহার ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের প্রাণান্তকর প্রয়াস দেখা দিল। বাংলার

লোক-সাহিত্যের প্রতিও তখনই এদেশের শিক্ষিত সমাজের সজাগ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু সে যুগের বাঙ্গালীর সাধনার অনেক বিষয়ের মত এই বিষয়েরও রবীন্দ্রনাথই পথপ্রদর্শক। ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির ভিতর দিয়া জাতির ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া ইহাকে আত্ম-মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন। সেই জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে প্রকাশিত 'পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার মধ্যেই 'বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়া' নামক একটি সুদীর্ঘ আলোচনা ও সংগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইহাই যে বাংলার লোক-সাহিত্যের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা, তাহাই নয়—এই শ্রেণীর আলোচনা ইহার পরও প্রকাশিত হয় নাই। এই আলোচনাটি বাঙ্গালী পাঠকের কেবল মাত্র যে একটি অপরিচিত বিষয় সম্পর্কে সামান্য কৌতূহল দূর করিল, তাহা নহে—ইহা বাংলার বিদগ্ধ সমাজের চিত্তভূমিতে এক অনন্ত রসের উৎস খুলিয়া দিয়া গেল। রবীন্দ্র-নাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে বাংলা লোক-সাহিত্যের কিছু কিছু যে সংগ্রহ প্রকাশিত না হইয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু উদ্দেশ্যহীন সংগ্রহ পাঠকের মনে স্থায়ী কোনও প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে না। আলোচনার ভিতর দিয়াই বিষয়ের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের আলোচনার একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা তত্ত্ব কিংবা তথ্যমূলক নহে—বরং রসোপলব্ধি মাত্র, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মত ইহাও সাহিত্য; রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশিষ্ট আবেদন ইহার মধ্য দিযাও ব্যর্থ হয় নাই। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধটি বাংলার শিক্ষিত সমাজে সে'দিন এক অতি সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য যে সর্বাংশেই সার্থক হইল, তাহা বলা যাইতে পারে না; তবে আংশিক সার্থক হইয়াছিল, এ পর্যন্ত বলা যায়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর প্রায় দশ বৎসর ব্যাপী ক্রমাগত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এ'দেশের লোক-সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আলোচনার ভিতর দিয়া জাতীয় সংস্কৃতির সাধনায় ইহার অপরিহার্যতার কথা যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরবর্তী লোক-সাহিত্য-প্রেমিকদিগের কেবলমাত্র ইহাদের সংগ্রহের ভিতর দিয়া তাহার গুরুত্বটুকু প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

এদিকে পাশ্চাত্ত্য জগতে লোক-সাহিত্যের অনুশীলন শিক্ষার একটি অপরিহার্য বিষয়রূপে গণ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছিল ; কিন্তু আমাদের দেশে তাহার প্রভাব আসিয়া তখন পর্যন্তও পৌঁছাইতে পারে নাই। সুতরাং যদিও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাই আমরা অনুসরণ করিয়াছিলাম, তথাপি জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের পথে নূতন নূতন উপকরণ যে ভাবে শিক্ষার অঙ্গীভূত হইযা থাকে, তাহা অস্বীকার করিয়াই আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইযাছে। সুতরাং জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস আমরা পাঠ করিলাম না। শিক্ষার ভিতর দিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ যখন অপরিচযের ব্যবধান উত্তীর্ণ হইযা গেল, তখন আমাদের প্রতিবেশীর পরিচযকেই আমরা উপেক্ষা করিলাম। জাতীয ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্যুত আমাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষাই আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রধান অন্তরায হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া আমরা আজও চলিতেছি, ইহার পর জগতের মধ্যে কত সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের যে উত্থান পতন ঘটিল, পুঁথির ভিতর দিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয স্থাপিত হইল সত্য, কিন্তু, আমাদের জীবনে তাহা সত্য হইযা উঠিল না। যদি তাহা হইত, তবে বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিযা জগতের দিকে তাকাইযা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম।

যাই হউক, পাশ্চাত্ত্য জগতে লোক-সাহিত্য অনুশীলনের প্রেরণা বিগত শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হইলেও আমাদের দেশে তাহার প্রভাব আজ পর্যন্ত কার্যকর হয় নাই। সুতরাং আজ হইতে ষাট বছরেরও আগে যে কথা রবীন্দ্রনাথ বলিযা গিয়াছিলেন, তাহাই এ'দেশের লোক-সাহিত্য সম্পর্কে আজও শেষ কথা হইয়া রহিযাছে। অথচ এই ষাট বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত ইহার রস ও গুরুত্ব যেমন আর কাহারও পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নাই, তেমনই পাশ্চাত্ত্য জগতের অনুকরণেও এ'দেশে ইহার অনুশীলন সম্ভব হইযা উঠে নাই। সুতরাং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট শিক্ষার ইহা আজও একটি বিষয় বলিয়াই গণ্য হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক সভায় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিযা বলিয়াছিলেন, 'দেশের

কাব্যে, গানে, ছড়ায় প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষি কুটীরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য, তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও, তবেই তোমারা যথার্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে; তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্বলতার অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জ্ঞানী সভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে।' বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর অগণিত ছাত্র বাহির হইয়া আসিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের মতে তাহাদের কেহই 'বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যথার্থ ছাত্র' নহে; কারণ, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে আজ পর্যন্ত কাহাকেও অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখা যায় নাই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব প্রত্যেকেরই পোষাকের উপর চক্‌চক্‌ করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কিংবা তাঁহার পরবর্তী কালেও যাঁহারা বাংলার লোক-সাহিত্য লইয়া কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সেন নিঃসন্দেহে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু লোক-সাহিত্যের যথার্থ অনুশীলনের পথে দীনেশচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যেই কতকগুলি অন্তরায় ছিল। প্রথমতঃ তিনি একান্ত আবেগ-প্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্যের যথাযথ পরিচয় প্রকাশ করিবার পক্ষে আবেগ-প্রবণতা যে একটি দুরন্ত বাধা, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি লোক-সাহিত্যের যথার্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ বাংলার প্রত্যক্ষ পল্লীজীবন হইতে লোক-সাহিত্যের কোন উপকরণই নিজে সংগ্রহ করেন নাই। সুতরাং লোক-সাহিত্যের যথার্থ ক্ষেত্র যে কোথায় নিহিত আছে, তাহা তিনি আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ একাধারে সংগ্রাহক ও সমালোচক দুইই ছিলেন, লোক-সাহিত্যের যথার্থ ক্ষেত্র যে কোথায়, তাহার সংবাদ তিনি রাখিতেন; সেই জন্য তাঁহার আলোচনার মধ্যে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে; দীনেশচন্দ্রের আলোচনায় সে-শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কেবল মাত্র তাঁহার অন্ধ হৃদয়াবেগ অবলম্বন করিয়া দীনেশচন্দ্র এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন—এই হৃদয়াবেগ প্রত্যক্ষ বিষয়-বস্তুর অভাবে অনেক

সময় সম্পূর্ণ অনাশ্রিত ও নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। অন্য কর্তৃক সংগৃহীত উপকরণই তাহার আলোচনার ভিত্তি ছিল, ইহাদের প্রয়োগ-ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁহার কোনও পরিচয় ছিল না। যে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' লোক-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ, তাহা তিনি সম্পাদনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করিলেও, যে সমাজ-জীবনে ইহাব উদ্ভব ও প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাব সঙ্গে তাহার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিৎ পণ্ডিতগণ কখনও এমন কাজ করিতে সাহসী হইতেন না। কারণ, লোক-সাহিত্য প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনের অন্তর্নিবিষ্ট বস-সম্পদ মাত্র. সমাজ-জীবনেব ক্রম-বিকাশের ধারার সঙ্গে ইহারও ক্রমবিকাশেব সূত্র গ্রথিত হইযা থাকে। সুতরাং সমাজের মর্মকোষের সন্ধান জানিতে না পাবিলে ইহাব তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায না। সমগ্র বাংলা দেশ ব্যাপিযা বঙ্গ ভাষাভাষী জন সমাজ বাস করা সত্ত্বেও, ইহাব একটি মাত্র অঞ্চলে যদি বিশেষ এক শ্রেণীব বসবস্তু জন্ম ও পুষ্টি-লাভ করে, তবে সেই দেশের বিশেষ প্রকৃতিই যে ইহাব জননী, তাহা ত সহজেই বুঝিতে পারা যায। কিন্তু যিনি ইহাব বস-বিশ্লেষণ কবিবেন, তাঁহাব পক্ষে যদি সেই বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পবিচয় স্থাপন কবা সম্ভব না হয়, তবে তাঁহার বিশ্লেষণেব যে মূল্য প্রকাশ পায, তাহা নির্ভবযোগ্য বলিযা গ্রহণ কবা চলে না। এমন কি, এই বিষয়ে 'ঠাকুবমাব ঝুলি' প্রমুখ রূপকথা সংগ্রাহক স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদাব ও উপকথা সংগ্রাহক স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি যে দাবী কবিতে পারেন, স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন তাহা পারেন না। অথচ এই বিষয়ক অনুবাগেব কথা বিবেচনা করিলে ইঁহাবা প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের সমকক্ষ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং লোক-সাহিত্য অনুশীলনের পক্ষে অনুরাগই যথেষ্ট নহে, যে নিবপেক্ষ বিচার দ্বারা লিখিত বা উচ্চতর সাহিত্যের বস বিশ্লেষণ করার আবশ্যক, ইহার মধ্যেও সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয—অন্ধ অনুরাগীদিগের দ্বারা তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সেনের আলোচনার মধ্যে একদিকে যেমন তাঁহার এই বিষয়ক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব, অন্যদিকে তেমনই এই অন্ধ অনুরাগের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে : সেই-জন্য তাঁহার আলোচনা অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত ভাবাতিশয্য দ্বারা ভারাক্রান্ত

হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন সে'দিন এই অনুরাগ দ্বারাই ইহাদিগকে বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; যদি ইহাদের প্রতি তাঁহার এই অনুরাগ না থাকিত, তবে তাহা বিদ্বজ্জন-সমাজের দৃষ্টিপথের অন্তরালবর্তী হইয়া থাকিত এবং তাহার ফলে বাংলা দেশের একটি অমূল্য সম্পদ্ আজ জন-সাধারণের অপরিচিত থাকিয়া যাইত।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যাঁহারা তাঁহার সমসাময়িক কালেই বাংলার লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের কার্যে ব্রতী হন, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ইঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা যথাক্রমে ব্রতকথা, উপকথা ও রূপকথার সংগ্রাহক—রবীন্দ্রনাথের মত কেহই ছড়া কিংবা গানের সংগ্রাহক নহেন। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিধর্ম তাঁহাকে বাংলার লৌকিক ছড়া ও গান-গুলির দিকে যে ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, কথাসাহিত্য সেভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু এ'কথা সত্য নহে। কারণ, বাংলার রূপকথা সম্পর্কে তাঁহার একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁহার সুগভীর অনুরাগের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তিনি যে তাঁহার ছড়া ও গানের সংগ্রহের মত কথার কোনও সংগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, ইহার তাৎপর্য এই যে, ছড়া ও গান সংগ্রহ করিবার তাঁহার যে সুযোগ সুবিধা হইয়াছিল, কথা সংগ্রহ করিবার তাঁহার সেই সুযোগ হয় নাই। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই যে লোক-সাহিত্যের একই উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা নহে। দেখা যায়, গীতিকার মত ব্রতকথা, রূপকথা ও উপকথার দিক দিয়া মৈমনসিংহ জিলার বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ সমৃদ্ধ। কারণ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ব্রতকথা সংগ্রহ 'ঠানদি'র থলে', রূপকথা-সংগ্রহ 'ঠাকুরমার ঝুলি ও 'ঠাকুরদার ঝোলা' এবং উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর 'উপকথা সংগ্রহ' 'টুনটুনির বই' প্রত্যেকটিই মৈমনসিংহ জিলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। এই বাংলা দেশের মাটির উপর বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন ফসল ফলে, তেমনই সমাজ-মনের বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশেও তেমনই নানা জাতির রসোপকরণের সৃষ্টি হয়। যাঁহারা একই জাতীয় জিনিষ সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহারা এই বিষয়টিই বুঝিতে পারেন না। বাংলা দেশের বিশেষ একটি পল্লী অঞ্চল হইতে রবীন্দ্রনাথ

একদিন ছড়া ও গীতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে অঞ্চলে কথা-সাহিত্যের অভাব ছিল, হয়ত তাহা নহে, তবে তাহা সংগ্রহ করিবার সুযোগ হয়ত তাঁহার ছিল না, কিংবা সেই অঞ্চলে সংগ্রহ করিবার মত উপকরণেরও হয় ত অভাব ছিল, তাহাও একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু তিনিই যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহার রূপকথা সংগ্রহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ক অনুরাগ কেবল মাত্র তাহার ছড়া ও গীতি-সংগ্রহের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলনা।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলার লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংগ্রহের কার্য হইয়াছে। এই সংগ্রহের কার্য সম্পূর্ণ না হইলে ইহার সম্পর্কে কোন আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। সুতরাং সে দিন সংগ্রহেরই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই প্রয়োজন আর আছে কি না, তাহা নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। যে প্রাচীন কৃষি-ভিত্তিক সমাজ জীবন অবলম্বন করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্য আপনার রস ও রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা পশ্চিম বঙ্গে আজ লুপ্ত হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে এখানে এক নূতন সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা যে কেবল মাত্র কৃষি-ভিত্তিক জীবন হইতে স্বতন্ত্র তাহা নহে—বরং ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী, তাহা শিল্প-কেন্দ্রিক। কৃষি-ভিত্তিক সমাজে গোষ্ঠী-চেতনা (Community Consciousness) যে ভাবে বিকাশ লাভ করে, শিল্প-কেন্দ্রিক সমাজে তাহা সে ভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। কৃষি-ভিত্তিক জীবনে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থ বড়, শিল্প-কেন্দ্রিক সমাজে ব্যক্তিস্বার্থই বড়, এখানে সমাজ-বোধ অনেকাংশে ম্লান হইয়া যায়। বাঙ্গালীর মনীষা এতকাল যাবৎ বৃহত্তর সমাজ-জীবনকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, আজ তাহার সম্মুখ হইতে সেই সমাজ-জীবনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। লোক-সাহিত্য বৃহত্তর সমাজ-মানসেরই সৃষ্টি, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি নহে। সুতরাং বৃহত্তর সমাজ-জীবনাশ্রিত হইয়া একদিন যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা কেবল মাত্র ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিল্পজীবনের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। যেখানে মানুষে মানুষে সহজ মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়, সেখানে সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হয় না ; কারণ, 'সহিত' বা মিলনের ভাব প্রকাশ করাই সাহিত্যের

উদ্দেশ্য। যেখানে মানুষে মানুষে এই সুনিবিড় মিলন ও সহযোগিতার ভাব লুপ্ত হইয়া যায়, সেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, কিন্তু যে সাহিত্য সামগ্রিক সমাজ-সংহতির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়, তাহা সৃষ্টি হইতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক জীবনে আজ এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে। শিল্প-জীবন ইহার নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রদেশটীর সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইহার প্রভাব স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং যে পল্লীজীবনের সংহতির ভিতর দিয়া ইহার লোক-সাহিত্য একদিন বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিল, সেই জীবন আজ অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং আজ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে লোক-সাহিত্যের নামে যাহা রচিত হইতেছে, তাহা পূর্ববর্তী রীতি মাত্রের অনুসরণ হইলেও প্রাণহীন; সুতরাং ইহাদের সংগ্রহ যেমন সাহিত্যিক পরিচয়কে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে না, তেমনই বৃহত্তর সমাজ-জীবনেরও কোন পরিচয় বহন করে না।

কিন্তু পূর্ব বাংলার অবস্থা পশ্চিম বঙ্গের অনুরূপ নহে। এখনও সেখানে কৃষি-ভিত্তিক সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়া শিল্প-কেন্দ্রিক জীবনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেখানে নগর আছে সত্য, কিন্তু সেখানকার নগর-নগরীগুলি পল্লী জীবনের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া এখন পর্যন্ত পুষ্টিলাভ করিতেছে, সেই জন্য সেখানকার লোক-সাহিত্যের বাহির ও অন্তরঙ্গে এখনও কোন সুস্পষ্ট পরিবর্তন অনুভব করা যায় না। সাহিত্যের উপকরণ রূপে তাহা এখনও অনুশীলনের যোগ্য। সুতরাং সেখানকার সংগ্রহের যে মূল্য, পশ্চিম বঙ্গের সংগ্রহের সে মূল্য নাই।

কিন্তু সংগ্রহের এখন পর্য্যন্তও নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা যায় না। কেবল মাত্র নির্বিচার সংগ্রহের মধ্য দিয়াই যথার্থ সাহিত্য বিচার হয় না, আর সাহিত্য বিচার না হইলে ইহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে না। বাংলা দেশে এ' পর্যন্ত যে সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু এই বিপুল সংগ্রহ দ্বারা রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক আলোচনা ব্যতীত, সাহিত্যে আর কোনও স্থায়ী কীর্তি স্থাপিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে যে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া যদি তাহাই শেষ কথা হইয়া থাকে, তবে

নূতন সংগ্রহেরও কিছু মাত্র আবশ্যক নাই। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, কেবল মাত্র সংগ্রহ রাশীকৃত করিয়া তুলিলেই এই বিষয়ে আমাদের কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্বন্ধে তাঁহার 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'র আলোচনা-প্রবন্ধটি যদি না লিখতেন, তবে তাঁহার ছড়ার সংগ্রহ দীর্ঘকাল ধরিয়া পাঠক-চিত্তে কৌতূহল জাগ্রত রাখিতে পারিত না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই সংগ্রহের কাজ বহু পূর্বেই শেষ হইয়াছে, এখন সেই সংগ্রহের ভিত্তিতে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহার মধ্য দিয়াই জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরম আত্মীয়তার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ইহারা কি ছিল, তাহা নহে—ইহাদের ভিতর দিয়া কি পাইলাম, তাহাই বড় কথা। আমাদেরও বিপুল সংগ্রহের মধ্য দিয়া যদি আমরা ইহাই অনুভব করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের সঞ্চয় যতই বাড়াইয়া তুলিনা কেন, তাহার কোনও মূল্য পাইব না।

বাংলার সংস্কৃতি বাংলার পল্লীতেই জন্ম ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে; সেইজন্য আজ যে নাগরিক সংস্কৃতি এ'দেশের উপর ইহার স্পর্দ্ধিত শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তাহা কিছুতেই জাতির মর্মমূলে নিজের শিকড় প্রবেশ করাইতে পারিতেছে না : উপরের দিক হইতে ইহাকে যতই শক্তিশালী বলিয়া মনে হইতেছে, ভিতরের দিক হইতে তাহা ততই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। অতএব কল্যাণের পথে সমাজকে যাহারা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, ধ্বংসোন্মুখ পল্লীজীবনের মধ্যেই এখনও তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানের সন্ধান করিতে হইবে।

লোক-শ্রুতি (folklore) জাতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট উপকরণ। লোক-মনের (folk-mind) পরিচয় ইহার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। পল্লীর সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, জনশ্রুতি, উৎসবানুষ্ঠান ইত্যাদি ইহারই অঙ্গ। অতএব ইহার অনুশীলনের ভিতর দিয়াই বাংলার জাতীয় লোক-সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজি শিক্ষার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে তাহার নিজস্ব লোক-শ্রুতির পরিচয় লুপ্ত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের বৈদেশিক শিক্ষা ও সাধনার প্রভাব তাহার জীবনে এতই সুদূরপ্রসারী হইয়াছে যে, তাহা অতিক্রম করিয়া তাহার পক্ষে এখন আর তাহার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা এক প্রকার

অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এ'কথা সত্য যে, সে পরিচয় ব্যতীত কোনও জাতিরই ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

এই কথা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি কয়িয়া আমি দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলার লোক-শ্রুতির বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাংলার পল্লী-সমাজের বনিয়াদ ইতিপূর্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া নূতন সমাজ ইতিমধ্যেই গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; এই পরিবর্তনের মুখে লোক-সংস্কৃতির প্রাচীন উপকরণসমূহ অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে; যে সকল উপকরণ ইতিপূর্বে আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাদের অধিকাংশই আজ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিতে হইলে ইহাদের মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইজন্য বাংলার কয়েকটি অঞ্চল হইতে আমার সংগৃহীত কিছু কিছু উপাদান আমি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট পরিবেশন করিতে মনস্থ করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়

শিব ও সূর্য

শিবের গাজন

বাঁকুড়া জিলায় ছাতনা একটি অতি প্রাচীন গ্রাম, কিন্তু বর্তমানে ইহা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে চণ্ডীদাস সম্পর্কিত এখনও বহু জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। পাঁচ শত বৎসর পূর্বে এই স্থানে কবি বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার সম্পর্কিত জনশ্রুতি নিরক্ষর পল্লীবাসীর স্মৃতিপথ বাহিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

ছাতনা গ্রামেরই একাংশের নাম কামারকুলি। কুলি শব্দের অর্থ গলি বা ইংরাজিতে lane। পূর্বে এখানে একমাত্র কর্মকার জাতিরই বাস ছিল, এখনও প্রধানতঃ তাহাই আছে; তবে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, কুম্ভকার এবং ময়রা জাতীয় লোকও আসিয়া কিছুকাল যাবৎ এখানে বসবাস করিতেছে। এই অঞ্চলে পথের ধারেই একটি শিবমন্দির আছে; মনে হয়, ছাতনা গ্রামে পূর্বে প্রত্যেক অংশেই এক একটি স্বতন্ত্র শিবমন্দির ছিল—এখনও অব্যবহার্য কয়েকটি শিবমন্দির ভগ্নদশায় সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

কামারকুলির শিবতলায় বৈশাখ সংক্রান্তির দিন প্রতি বৎসর গাজন হয়। এই তারিখটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। বাংলার সর্বত্রই চৈত্র-সংক্রান্তির দিন শিবের গাজন হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে তাহার পরিবর্তে বৈশাখ সংক্রান্তির দিনটি এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আছে। গ্রামবাসিগণ ইহার কোনও সুস্পষ্ট কারণ বলিতে পারে না। তাহারা বলে, এখানে ইহাই নিয়ম। কিন্তু ইহার কারণ একেবারে দুর্বোধ্য নহে। ছাতনা গ্রামের যখন পূর্বশ্রী বর্তমান ছিল, তখন সমগ্র গ্রামের পক্ষ হইতে যে গাজন হইত, তাহা চৈত্র সংক্রান্তির দিনই হইত। কামারকুলি ছাতনা গ্রামের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, ইহার অধিবাসিগণ সমগ্র গ্রামের মূল উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সে দিন নিজেরা

স্বতন্ত্রভাবে কোনও অনুষ্ঠান করিত না। তাহাদের নিজেদের অনুষ্ঠানটির জন্য পরবর্ত্তী মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিত। তারপর বর্গীর হাঙ্গামার সময় হইতেই হউক, কিংবা অন্য কোনও দুর্বিপাকেই হউক, সমগ্র গ্রামের মূল অনুষ্ঠানটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কামারকুলির অধিবাসিগণ তাহাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাহাদের অনুষ্ঠানটি বৈশাখ সংক্রান্তির দিনই প্রতিপালন করিয়া যাইতেছে। কিংবা ইহার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের ধর্মে গাজন একটি বিশিষ্ট লৌকিক ধর্মোৎসব। ইহা সাধারণতঃ চৈত্রী পূর্ণিমার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্যন্ত যে কোনও পূর্ণিমা কিংবা সংক্রান্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়। কামারকুলির শিবমন্দিরটি পূর্বে ধর্মঠাকুরের মন্দির থাকাও অসম্ভব নয়, যদি তাহাই হয়, তবে বৈশাখ সংক্রান্তির দিনে ইহার বাৎসারিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে কোন বাধা নাই। তারপর শৈবধর্মের প্রভাব বশতঃ ধর্মঠাকুরের মন্দির যখন শিবমন্দিরে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে তখনও ইহার বাৎসরিক অনুষ্ঠানের তারিখটি পরিবর্তিত হয় নাই। ১৩৫৪ সালের বৈশাখ সংক্রান্তির অনুষ্ঠানটির নিম্নে বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাইবে।

শিবমন্দিরটি কামারকুলির বারোয়ারী সম্পত্তি। সংক্রান্তির কিছুদিন পূর্বেই গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া অনুষ্ঠানের ব্যয়ের একটা হিসাব স্থির করিল। সেই অনুসারে প্রত্যেকের গৃহ হইতেই চাঁদা সংগ্রহ করা আরম্ভ হইল। অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবার ভার পড়িল কুম্ভকার জাতীয় একজন লোকের উপর। সংগৃহীত চাঁদা তাহার নিকটই জমা হইতে লাগিল। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কামারকুলিতে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণেরও বাস আছে। কিন্তু বাৎসরিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাহাদিগের কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে দেখা গেল না। ইহার কারণও দুর্বোধ্য নহে—ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ এই গ্রামে কেবলমাত্র যে নবাগত তাহাই নহে, পল্লীর মধ্যে তাঁহার কোনও প্রভাবই স্থাপন করিতে পারেন নাই। বাংলার পল্লী-সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম যে কি ভাবে সক্রিয় রহিয়াছে, ইহাতে তাহার একটি নিদর্শন পাওয়া যাইবে। পল্লীর এই ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের স্থান সম্পর্কে পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। যাই হউক, কুম্ভকার জাতীয়

কর্মাধ্যক্ষই পূজার সকল প্রকার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল। এই ব্যক্তিটি বহু কালাবধি গাজনে 'পাটভক্ত্যা' (পরে দ্রষ্টব্য) হইয়া আসিতেছে। বয়স ৬০।৬২ হইবে; বর্তমানে তাহার পুত্র প্রায় ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়াছে। সে এই বৎসরই 'পাটভক্ত্যা'র কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই কার্যের ভার তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর ন্যস্ত করিয়াছে। এই কার্যেই তাহাদের পুরুষানুক্রমিক অধিকার। পাটভক্ত্যার কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও সে কার্যের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার এখনও নিজের উপরই রাখিয়াছে।

সংক্রান্তির তিন দিন পূর্বেই পাটভক্ত্যাসহ চারিজন ভক্ত্যা মন্দিরে আসিয়া তাহারা সে বৎসরের জন্য ভক্ত্যা হইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিল। ভক্ত্যা হইতে হইলে এই কয়দিন শিবমন্দিরের সংশ্লিষ্ট সকল কাজেই অংশ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া প্রথমতঃ তাহাদিগকে সকল প্রকার অশৌচ হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। পাটভক্ত্যার এই কার্যে অংশ গ্রহণ করা পুরুষানুক্রমিক দায়িত্ব—ইহা হইতে তাহার নিষ্কৃতির কোনও উপায় নাই। কোন কোন জায়গায় পাটভক্ত্যাগণ তাহাদের এই কার্যের বিনিময়ে জমিদার কিংবা গ্রামের জনসাধারণের পক্ষ হইতে পুরুষানুক্রমিক নিষ্কর জমি ভোগ করিয়া থাকে। তবে কামারকুলির পাটভক্ত্যা কাহারও নিকট হইতে কোনও জমি ভোগ করে না সত্য, তথাপি গ্রামের জন-সাধারণের বিশ্বাস, এই কার্য তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ সম্পন্ন করিতে পারে না—এই কার্যের জন্য তাহারা শিবের দ্বারা বিশেষভাবে অনু-গৃহীত কিংবা আদিষ্ট। পাটভক্ত্যা ব্যতীত অন্য ভক্ত্যাদিগের সম্বন্ধে কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। কেহ দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য শিবের নিকট মানসিক করিয়া ভক্ত্যা হয়, কেহ ভবিষ্যৎ কোন ঐহিক ফললাভের কামনায় দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া ভক্ত্যা হয়, কেহ দেবতার নিকট মানসিক করিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করিবার পর মানসিক পূরণ করিবার জন্য ভক্ত্যা হয়, কেহ সাধারণ পারিবারিক মঙ্গল কামনায়ও ভক্ত্যা হয়, আবার কেহ নিতান্ত সাধ করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার জন্যও যে ভক্ত্যা না হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, উৎসবের কয়দিন সকলের দৃষ্টি ভক্ত্যাদের উপরই সর্বতোভাবে নিবদ্ধ থাকে।

সংক্রান্তির দুইদিন পূর্বে ভক্ত্যাগণ মন্দিরে সমবেত হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রারম্ভিক একটি সামান্য অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করিয়া (শিবের নামে একটি বিল্বপত্র ও পুষ্পদান করিয়া) তাহার প্রসাদী পুষ্প ও বিল্বপত্র ভক্ত্যাদের হাতে দিলেন। তারপর তাহাদের প্রত্যেকেব গলায একটি কবিয়া 'উপবীত' এবং হাতে এক-খণ্ড করিয়া বেত দিযা দিলেন। 'উপবীত'টি তাহারা মালাব মত করিযা গলায় পরিল ও বেত্রখণ্ড হাতে লইল। অনুষ্ঠান শেষ না হওযা পর্যন্ত এই দুইটি জিনিষ কিছুতেই তাহাদের সঙ্গচ্যুত হইতে পাবিবে না। হাতে 'বেত' লইবার তাৎপর্য বুঝিতে পাবা গেল না। উপবীত ধাবণ করিবার এই তাৎপর্য যে, ইহা দ্বারা তাহাদিগকে দেবকার্যেব অধিকার দেওযা হইল। যাই হউক, তাহারা সেইদিন হইতে উপবাস ব্রত গ্রহণ করিল—এই উপলক্ষে কেহ একেবারে নিরম্বু উপবাস, কেহ সামান্য ফলমূল ও দুগ্ধ মাত্র পান করিযা থাকে এবং স্নানান্তে এক বস্ত্রে ভিজা কাপড় গাযে শুকাইযা এই কযদিন কাটাইয়া থাকে। ব্যক্তি ও স্থান বিশেষে এই সকল নিযমেব প্রায়ই তারতম্য হইযা থাকে। আনুষঙ্গিক নিয়ম পালনে পাটভক্ত্যা ও সাধাবণ ভক্ত্যার কোনও পার্থক্য নাই।

পুরোহিতের দক্ষিণা

বৈশাখ-সংক্রান্তির দিন প্রভাত হইতেই মন্দির-প্রাঙ্গণ যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইল ; মন্দির-সম্মুখস্থ অপরিস.' স্থানটুকুর উপর বৃক্ষপত্র দ্বারা আচ্ছাদন রচনা করিয়া দেওয়া হইল। গ্রামের জনসাধারণ কর্তৃক স্থানীয় পদ্মদীঘি হইতে সংগৃহীত পদ্মকোরকের মালায় ক্ষুদ্র শিবমন্দিরটি ঘিরিয়া দেওয়া হইল। প্রখর রৌদ্রে মধ্যাহ্নের পূর্বেই অস্ফুট পদ্মকোরকগুলি শুকাইয়া কাগজের মত সাদা হইয়া গেল।

বেলা দশটার সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিত আসিয়া শিব পূজায় বসিলেন। সাধারণ পূজা শেষ হইলে পর 'বিশেষ পূজা', যজ্ঞ, হোম ইত্যাদি আরম্ভ হইল। তৎপূর্বেই মন্দির মধ্যে রক্ষিত একটি বিশেষ 'পাট' (ইহার মধ্যস্থলে লৌহশলকা রাশি প্রোথিত এবং কণ্ঠ ও কটিদেশ স্থাপন করিবার স্থলে দুইটি কাটারী রক্ষিত) বাহিরে আনিয়া বিশেষরূপে ধৌত করা হইল। ইহার উপর তৈল সিন্দুর, হরিদ্রা প্রভৃতি দিয়া ইহাকে বিশেষভাবে মার্জিত করা হইল ; তারপর ইহা মন্দিরের দরজার একপাশে রাখিয়া দেওয়া হইল। ভক্ত্যাগণ মন্দিরের আঙ্গিনায় বারবার যাতায়াত করিতে লাগিল, তাহাদের গলায় 'পৈতা', হাতে বেত্রদণ্ড—তাহাদের এই গর্বিত পরিচয় গ্রামের সমাগত কৌতূহলী বালক-বালিকাদের (অধিকাংশই উলঙ্গ) মধ্যে সুগভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক্ করিতে লাগিল। বেলা ১২টার সময় দুবরাজপুর (সংলগ্ন গ্রাম) হইতে ভক্ত্যাগণ গিয়া নিয়মিত ঠাকুরের 'ঘোড়া' লইয়া আসিবার আয়োজন করিতে লাগিল। বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু বাদ্যকরগণ সময়মত আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নানা অপ্রীতিকর মন্তব্য করিতে করিতে ভক্ত্যাগণ নিজেরাই দুবরাজপুরের দিকে যাত্রা করিল। ধর্মঠাকুর কিংবা শিবের বাৎসরিক গাজন উপলক্ষ্যে গ্রামান্তর হইতে বিগ্রহ কিংবা তাঁহার বাহক ধার করিয়া লইয়া আসিবার রীতি পশ্চিম বঙ্গের অনেক অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। কিন্তু একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে। কামারকুলিতে যাঁহার গাজনোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, তিনি শিব। পৌরাণিক শিবের বাহন বৃষ, ঘোড়া নহে।

কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে, শিবের গাজন উপলক্ষে সংলগ্ন গ্রাম হইতে অনুষ্ঠানিকভাবে একটি অশ্বমূর্তি আনিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহার কারণ কি?

একথা সকলেই জানেন যে, পশ্চিম বাংলার লৌকিক দেবতা ধর্ম ঠাকুরের বাহন মাটির ঘোড়া। হিন্দু প্রভাবের ফলে এই অঞ্চলের বহু ধর্মমন্দির শিব মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এখানেও দেখা যাইতেছে, কামারকুলির শিব-মন্দিরটিও পূর্বে ধর্মঠাকুরের মন্দির ছিল, এই সূত্রেই গ্রামান্তর হইতে তাহার বাহন মাটির ঘোড়া আনিবার রীতি প্রবর্তিত হইযাছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহা হিন্দু প্রভাব বশতঃ শিবমন্দিরে পরিবর্তিত হইযা গিযা ইহার দেবতা ধর্মঠাকুর হইতে শিবঠাকুরে পরিণত হইযা যান, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গ্রামান্তর হইতে ঘোড়া আনিবার রীতিটি পরিত্যক্ত হয নাই। শিবের সঙ্গে ঘোড়ার কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও, এই সম্পর্কে যে রীতিটির উদ্ভব হইযাছিল, লোক-সমাজে তাহা অব্যাহত রহিয়া গিযাছে। পশ্চিম বাংলার বহু গ্রাম্য মন্দিরের মধ্য হইতে এই প্রকার ধর্ম-সমন্বযের বিচিত্র ইতিহাস এখনও উদ্ধার করা যাইতে পারে।

বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, যজ্ঞাগ্নিজাত ধূম্রকুণ্ডলীতে মন্দির অভ্যন্তর ততই আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। গ্রামের পূজার্থিনী নারীগণ (কোন কোন স্থলে পুরুষও) তাহাদের নিজেদের পারিবারিক পূজার উপকরণ লইযা মন্দিরে আসিতে লাগিল। পূজার উপকরণের মধ্যে কিছু আতপ চাউল, ২।১টি পাকা কলা, সামান্য কিছু মিষ্টদ্রব্য, স্থানীয ময়রার দোকান হইতে ক্রীত ২।১টি চিনির সন্দেশই অধিক। পূজোপকরণগুলি পূজারিণীরা মন্দিরের মধ্যে রাখিযা যাইতে লাগিলেন। কোন কোন বর্ষীযসী রমণী মন্দিরের দ্বারদেশে বসিযা মন্দিরস্থ দেবতার উদ্দেশ্যে নিজেদের নানা ঐহিক অভীষ্টসিদ্ধির কামনা জানাইতে লাগিল। তন্মধ্যে একটি প্রৌঢ়া মহিলা তাহার পৌত্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার সাফল্যের জন্য দেবতার নিকট বার বার প্রার্থনা করিতে স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিযা যজ্ঞাগ্নিতে বার বার ঘৃতাহুতি দিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠে শোনা যাইতে লাগিল, 'প্রজাপতি ঋষি গাযত্রীছন্দ অগ্নির্দেবতা' ইত্যাদি দুরূহ সংস্কৃত মন্ত্র শুনিযা সমবেত জনতা ভক্তিতে স্তম্ভিত হইযা স্থির হইযা রহিল। শিবপূজার সঙ্গে এই সকল মন্ত্র যে কি ভাবে যুক্ত হইযাছে, তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় পুরোহিত যজ্ঞ সমাধা করিয়া 'শান্তি' জলের পাত্র লইয়া মন্দিরের বারান্দায় আসিলেন। প্রথমতঃ পাটভক্ত্যার (মূল ভক্ত্যা) কপালে তাহা হইতে যজ্ঞভস্ম সংমিশ্রিত 'শান্তি' জলের তিলক পরাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর এক একজন করিয়া ভক্ত্যাদের ললাটে 'শান্তি'র তিলক পরান হইল। তারপর সমবেত সকলের ললাটেই (স্ত্রীলোকদিগকে বাদ দিয়া বালবৃদ্ধ নির্বিশেষে) তিলক পরাইয়া অর্থাৎ প্রত্যেকের ললাটে পুরোহিত অনামিকাটি স্পর্শ করাইয়া যাইতে লাগিলেন। আমিও আমার সহকারী মন্দিরের বারান্দার এক পার্শ্বে নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বসিয়াছিলাম; আমরাও ক্রমে সাহসে ভর করিয়া পুরোহিতের উদ্যত অনামিকার সম্মুখে আমাদের ললাট অগ্রসর করিয়া দিলাম. আমার ললাটের এক পার্শ্বে এবং আমার সহকারীর বামভুরুর কিঞ্চিৎ উপরিভাগে একটি করিয়া ক্ষীণ তিলক-চিহ্ন পড়িল।

অতঃপর পুরোহিত সমবেত জনতার মধ্যে কিছুক্ষণ 'শান্তি' জল ছিটাইয়া মন্দিরের বারান্দায় রক্ষিত পূর্বোক্ত পাটটির নিকট গিয়াও নিম্নকণ্ঠে কি মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন। এ যাবৎ পুরোহিত উচ্চকণ্ঠেই সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহার কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিল, কোন কথাই তাঁহার বুঝিতে পারা গেল না। অথচ কি মন্ত্র বলিয়া পাটটিকে তিনি 'পূজা' করেন তাহা জানিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, পাট-পূজার কোনও সংস্কৃত মন্ত্র প্রচলিত না থাকিবারই কথা। যাই হউক, পুরোহিত নিতান্ত নিম্নকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পাটটিকে যথাবিধি 'পূজা' করিতে লাগিলেন। তাম্রপাত্র হইতে শান্তিবারি ও কোষা হইতে সামান্য কিছু কিছু জল বার বার পাটের উপর দেওয়া হইতে লাগিল। তারপর তাম্রপাত্র হস্তে পুরোহিত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

এইবার পুরোহিতের দক্ষিণার পালা। ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে দক্ষিণাস্বরূপ দুই আনা ও 'জলখাবার' বাবত আরও দুই আনা দেওয়া হইল। ইহাতে পুরোহিত ক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণার পয়সা মন্দিরের বারান্দায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ সারাদিন উপবাসী, তারপর এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন, ক্ষুধায় এবং পরিশ্রমে তাঁহার দেহ

অবসন্ন, সমস্ত দিনের এই কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ মাত্র চারি আনা পয়সা। অতএব তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুমাত্র নাই; কারণ, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও মানুষ,—দেবতা নহেন। ব্রাহ্মণ উচ্চকণ্ঠে এই প্রকার অভিযোগ প্রচার করিতে লাগিলেন, 'পূজার সকল অঙ্গই ঠিক আছে, পাটভক্ত্যার গামছাও আছে, বাদ্যভাণ্ডের জন্য ছয়টা ঢাকও আছে; গাম্‌ছার মূল্য চারি আনা হইতে পাঁচ সিকা হইয়াছে, বাদ্যকরের দাবীও পাঁচ টাকা হইতে বিশ টাকায় উঠিয়াছে; কিন্তু হতভাগ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বেলায় যেই দুই আনা, সেই দুই আনা ঠিকই আছে।' এখানে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, 'জলখাবার' বলিয়া যে অতিরিক্ত দুই আনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'dearness allowance' মাত্র। পুরোহিত বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কাহারও ব্যক্তিগত পূজা হইলে এই দুই আনাতেই তিনি কোনও আপত্তি করিতেন না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা গ্রামের বারোয়ারী পূজা; পুরোহিত অন্য পাড়ার লোক (এখানে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে যিনি এই পূজা প্রতি বৎসর করিয়া থাকেন, তাঁহার সহসা জাতাশৌচ হওয়াতে তিনি পূজা করাইতে পারিলেন না বলিয়া অন্য পাড়া হইতে এই পুরোহিতকে সংগ্রহ করা হইয়াছে)। পুরোহিত বলিলেন, 'সারাদিন উপবাস থাকিয়া এই দারুণ গ্রীষ্মে এত কঠিন পরিশ্রম করিবার মূল্য যদি এই হয়, তবে কোন দেবকার্যে ভবিষ্যতে আর পুরোহিত পাওয়া যাইবে না; সকলের মজুরীই যুদ্ধের বাজারে বাড়িয়াছে, কেবল হতভাগ্য ব্রাহ্মণের বেলাতেই কার্পণ্য।' পুরোহিত এই সকল অভিযোগ উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার অন্যান্য অকিঞ্চিৎকর প্রাপ্যগুলি (যথা প্রায় এক সের অনুমান আতপ চাউল ও ২।১টি কলা ও সামান্য কিছু গুড়) একটি পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িলেন এবং দ্রুতপদে একেবারে পথে নামিয়া পড়িলেন। ভক্ত্যাগণ করজোড়ে রুষ্ট ব্রাহ্মণের দিকে বিনীত দৃষ্টিপাত করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। পাটভক্ত্যা বিনীত স্বরে বলিল, গ্রামের দশজন যে রকম ফর্দ ধরিয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম করিবার তাহার উপায় নাই; প্রতি বৎসরই এই পরিমাণই দক্ষিণা দেওয়া হয়। প্রতি বৎসরের ফর্দ অনুযায়ীই সে বৎসরও পুরোহিতের প্রাপ্য স্থির করা হইয়াছে। পুরোহিত সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পথ

ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; কেবল বলিলেন, 'এই দুই আনা পয়সাও তোমাদিগকে দিয়ে গেলাম'। যিনি এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর পূজা করাইয়া থাকেন, তিনিও মন্দিরের দ্বারে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াই ছিলেন ; পুরোহিত সত্যই চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, তিনি পাটভক্ত্যাকে বলিলেন, 'দাও, আর দু' আনা পয়সা ব্রাহ্মণকে ধ'রে দাও।' পাটভক্ত্যা বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না ; গাঁট হইতে আরও দুই আনা বাহির করিয়া মন্দিরের বারান্দার উপরে রাখিয়া দিল। পূর্বোক্ত প্রাচীন পুরোহিত তখন ডাকিলেন, 'ও নরেন, শোন, নাও, নাও, আর আপত্তি ক'রো না, আরও কিছু ধরে দেওয়া গেল।' পুরোহিত তাঁহার পূর্বোক্ত অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে নিতান্ত অপ্রসন্ন মুখে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর প্রাচীন পুরোহিতের হাত হইতে এবার তাঁহার প্রাপ্য হাত পাতিয়া লইলেন। পাটভক্ত্যা বলিল, 'কি করব বলুন দা' ঠাকুর, গাঁয়ের কি সে'দিন আর আছে ? পুজো একটা বছরে একদিন না করলেই নয়, তাই করতে হয়। পুজোর নামে গাঁ থেকে এক পয়সা আর আদায় হয় না। কেউ দিতে চায় না, ইচ্ছে থাকলেও অনেকের উপায় নেই, ইত্যাদি আরও অনেক মামুলী কথা বলিযা যাইতে লাগিলেন। পুরোহিত একজনের হাত হইতে একটা প্রজ্বলিত কল্‌কে লইয়া তাহাতে টান দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন—অতিরিক্ত দুই আনা পয়সা পাওয়া সত্ত্বেও মুখ প্রসন্ন দেখাইল না।

পাট পূজা

সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্বে মন্দিরের দরজার সম্মুখে যে পাটটি আনিয়া দ্বিপ্রহর হইতেই স্থাপন করা হইয়াছিল, পাটভক্ত্যা তাহার নিকট গিয়া ইহাকে 'পূজা' করিতে লাগিল। আদ্যোপান্ত লৌহ-শলাকাবিদ্ধ আনুমানিক তিন হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া একটি কাঠের তক্তাকেই পাট বলে। দেবতার নামে কৃচ্ছ্র সাধনার অঙ্গরূপে এই লৌহ-শলাকার উপর শয়ন করাকে 'শালে ভর দেওয়া' বলা হয। ধর্মঠাকুরের পূজার ইহা একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। কালক্রমে ইহা এই অঞ্চলের লৌকিক শিবপূজার উপরও প্রসার লাভ করিয়াছে।

পাটভক্ত্যা তৈল-সিন্দুর-হরিদ্রা প্রভৃতি দিয়া পাটটিকে রঞ্জিত করিয়া ইহার উপর বিভিন্ন পুষ্প স্থাপন করিল। অতঃপর ইহার উপর কিছু জল ছিটাইয়া দিল। অন্যান্য ভক্ত্যারা আসিযাও তাহার এই কার্যে সহায়তা করিতে লাগিল এবং পূর্বোক্ত মাতব্বর ব্যক্তিটি এই কার্যে নির্দেশ দিতে লাগিল। সকলে বাদ্যকর ডোমদিগের জন্য অসহিষ্ণুভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কারণ, তাহারা আসিযা পৌঁছিলেই এইবার বাদ্যভাণ্ড সহ পাটটি পুকুর ঘাটে লইয়া যাইবার পালা আরম্ভ হইবে। বাদ্যকরেরা পূর্ব রাত্রে এক বিবাহের বায়না লইয়া গ্রামান্তরে গিয়াছিল, সেইজন্য তাহাদের আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। সমবেত জনতা তাহাদের উদ্দেশ্যে নানা মতবাদ প্রকাশ করিতে লাগিল, কেহ ভবিষ্যতে আর তাহাদিগকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হইবে না বলিয়া শপথ গ্রহণ করিল, কেহ তাহাদের চতুর্দশ পুরুষের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার পারলৌকিক অকল্যাণ কামনা করিতে লাগিল। এমন সময় দূরে ঢাকের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল; জনতা উল্লাস ধ্বনি করিয়া উঠিল। 'আস্‌ছে রে আস্‌ছে' বলিয়া ছেলেপিলেরা অগ্রসর হইয়া তাহারা কতদূর ব্যবধানে আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেল। ছয়টি ঢাক ও দশটি টিকারা তৎসহ কয়েকটি কাঁশি বাজাইতে বাজাইতে বাদ্যকার দল মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, তাহাদের সম্বন্ধে অসাধু সঙ্কল্প তাহারা আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মন হইতে দূর হইয়া গেল।

পাটটি একটি নূতন গামছা দিযা আদ্যোপান্ত আচ্ছাদিত করিয়া দেওযা হইল। পাটভক্ত্যা তখন ইহাকে মাথায লইযা 'রাজার বাঁধে'র দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড ও সমবেত সমগ্র জনতা অগ্রসর হইতে লাগিল। পথিপার্শ্বস্থ গৃহগুলি হইতে কুলবধূগণ গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিযা এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধ পাটভক্ত্যার পিছন পিছন 'রাজার বাঁধে'র দিকে অগ্রসর হইল। পাটভক্ত্যার পিছনেই সাধারণ ভক্ত্যাগণ, তাহাদের পিছনে পূর্বোক্ত গ্রামবৃদ্ধ ও তাহার পিছনে জনতা চলিতে লাগিল। গ্রীষ্মের তপ্ত সূর্য তখন পশ্চিমের দিক্‌চক্ররেখায মুমূর্ষুর শেষ হাসি হাসিযা মুহূর্তে অন্তর্হিত হইযা গেল। বাদ্যভাণ্ড আশেপাশের চারি পাঁচখানি গ্রাম উচ্চকিত করিযা বিপুল শব্দে বাজিতে লাগিল।

পাটভক্ত্যা রাজার বাঁধে আসিযা পৌঁছিল। মন্দির হইতে ইহার ব্যবধান আধ মাইলের অনধিক। বাঁধটি আকারে নিতান্ত মন্দ নহে। তবে ইহার জল শৈবালাচ্ছন্ন। জনতা পাটভক্ত্যার পিছন পিছন আসিযা ঘাটে দাঁডাইল। পাটটি মাথা হইতে নামাইবা মাত্র একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। দুইজন ভক্ত্যা পরস্পর বিপরীত মুখে জলের কিনারা ধরিযা পুকুর প্রদক্ষিণ করিযা সাধ্যমত দৌডাইতে লাগিল। অপর তীরে যেখানে পরস্পরের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল সেখানে তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিযা পুনরায যে যাহার পথে দৌডাইতে লাগিল। এইভাবে তাহারা উভযেই পুকুর প্রদক্ষিণ করিযা আসিযা যে জাযগাতে পাটটি নামান হইযাছিল, সে জাযগায বসিযা পডিল। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ভক্ত্যাগণ তিন দিন যাবৎ উপবাসী, অতএব এই অবস্থায় এত বড পুকুরের চারিধার দৌড়াইযা আসা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। যাহা হউক, তাহারা ফিরিযা আসিযা মাটিতে বসিযা পড়িযা হাঁপাইতে লাগিল। জনতার মধ্য হইতে দুই একজন লোক তাহাদের উপর গামছা দিযা হাওযা করিতে লাগিল। অতঃপর ভক্ত্যাগণ সকলেই পুকুরে নামিয়া স্নান করিযা আসিল। এখানে পাটটির উপর হইতে গামছা সরাইযা লইয়া পূর্ব প্রণালী অনুসারে 'পূজা' করা হইতে লাগিল। সাজি হইতে আরও ফুল লইয়া ইহার উপর চাপান হইল; ফুলের মধ্যে অধিকাংশই শ্বেত পদ্ম। পাটে একটি নূতন গামছা বাঁধা ছিল। পাটভক্ত্যা তাহার ভিজা

কাপড় ছাড়িয়া নূতন গামছাটি পরিল, তাহাতে তাহার হাঁটুর উপর পর্যন্ত কোন প্রকারে আচ্ছাদন হইল। পাটটি আনিয়া পুকুরঘাটে নামাইবার সময় হইতেই সমবেত জনতা নানা প্রকার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছিল ; যেমন : 'কামার কুলির ভোলা মহেশ্বর মুনি মহাদেবের জয়,' এইভাবে ষোলবনের মহুলেশ্বর মুনি মহাদেব, একেশ্বরের একেশ্বর মুনি মহাদেব, কাশী বিশ্বেশ্বর মুনি মহাদেব প্রত্যেকেরই নাম উল্লেখ করিয়া বারবার জয়ধ্বনি ঘোষণা করা হইতে লাগিল। উচ্চ বাদ্যধ্বনি ভেদ করিয়া জয়ধ্বনি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

এইভাবে পূর্বোক্ত মুরুব্বির নির্দেশমত পাটভক্ত্যা কর্তৃক পাটপূজা নিষ্পন্ন হইলে পাটভক্ত্যা পুনরায় পাটটি মাথায় লইল। অন্যান্য ভক্ত্যা, জনতা ও বাদ্যভাণ্ড তাহার পিছন পিছন অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে—ঢাক ও নাগরার শব্দে সমস্ত গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পাটভক্ত্যা এইবার ঘুরিয়া অন্যপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যে পথ দিয়া বাঁধে গিয়া পৌঁছাইয়াছিল, সে পথ পাশে পড়িয়া রহিল। গ্রামের উত্তর সীমানা ধরিয়া একটি পথ পূর্বদিকে গিয়াছে, সেই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক চৌমাথায় আসিয়া থামিল। সেইখানেই মাঝপথে মাথা হইতে পাটটি নামাইল। জনতাও পাটটি ঘিরিয়া সেখানেই দাঁড়াইল। বাদ্যকরের দল জনতার মধ্যে মিলিয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করিয়া উচ্চতালে বাজাইতে লাগিল। পাটভক্ত্যা পাটটির নিকট বসিয়া ইহার মধ্যে যত ফুল ও বেলপাতা ছিল, তাহা চারিদিকে জনতার উপর ছুঁড়িয়া দিতে লাগিল। সেই ফুল ও বেলপাতা পরম পবিত্র বিবেচনা করিয়া সকলেই তাহা ধরিবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। কয়েকটি সাঁওতাল মেয়ে জনতা হইতে সামান্য একটু দূরে এক গাছের নীচে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও কাছে আসিয়া দু একটি ফুল ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের চেষ্টা একেবারে বিফল হইল না।

একজন প্রৌঢ় গ্রামবাসীর হাতে একটি ফুলের সাজিতে কতকগুলি মালা ছিল ; পাটভক্ত্যা সেই মালা লইয়া নিজের গলায় একটি নিজেই পরিল, অন্যান্য ভক্ত্যাদেরও পরাইল। তারপর অবশিষ্ট কয়েকটি মালা সমবেত জনতার মধ্যে যাহারা দৃশ্যতঃ একটু সম্ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইল, তাহাদের গলায় পরাইয়া দিল।

এই সকল কাজ শেষ হওয়ার পর পাটটি যখন সম্পূর্ণ শূন্য হইল, তখন ইহার মাথার দিকে একটি ঘটি উপুড় করিয়া একটি নূতন গামছা দিয়া বাঁধা হইল। তারপর বারবার কপালে হাত ঠেকাইয়া পাটভক্ত্যা ধীরে ধীরে সেই পাটটির উপরিস্থিত ঊর্ধ্বমুখ লৌহশলাকাগুলির উপর চিৎ হইয়া শুইল। তাহার মাথাটি একটু উঁচু হইয়া গামছা দিয়া বাঁধা ঘটির উপর ন্যস্ত রহিল—তাহার ঘাড়ের নীচে রহিল একটি কাটারি, পিঠের নীচে ঊর্ধ্বমুখ লৌহ শলাকাগুলি, কোমরের নীচে আর একটি কাটারি, পা দুইটি জড় করিয়া হাঁটু দুইটি গুটাইয়া উপরের দিকে উঁচু করিয়া রাখিল। ইহার নামই 'শালে ভর দেওয়া'। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক কাব্য ধর্মমঙ্গলে রঞ্জাবতীর শালে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

পাটের তলদেশ দিয়া দুইটি কাঠ সমান্তরালভাবে দুই দিক দিয়াই বাহির হইয়াছিল ; ভক্ত্যা ও অন্যান্য কয়েকজন গ্রামবাসী সেই অংশ কাঁধে লইয়া পাটভক্ত্যাসহ পাটটি মাটি হইতে তুলিয়া লইল। তারপর সকলে ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েকজন ব্যক্তি 'শরশয্যা'য শায়িত পাটভক্ত্যাকে তালপাতার পাখা দিয়া ঘন ঘন বাতাস করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাদ্যভাণ্ড এইবার জনতার অগ্রভাগে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েকজন ব্যক্তি বাদ্যের তালে তালে পা ফেলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ঢাকের শব্দ বাড়িল, নাগ্‌রা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, অন্ধকারের মধ্যে কযেকটি মশাল জ্বলিল, দেখিতে দেখিতে গ্রামপথ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

জনতা অতি ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ; গৃহ-বাতায়নে কুলবধূরা বহুক্ষণ যাবৎ প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাদের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে পাটভক্ত্যাকে কাঁধে লইয়া জনতা চলিতে লাগিল। কেহ পাটস্থিত ভক্ত্যার উদ্দেশ্যে কপালে যুক্ত কর ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। সকলের বিশ্বাস হইল, পাটভক্ত্যার উপর মহাদেবের অধিষ্ঠান হইয়াছে, নতুবা এমন দুঃসাহসিক কার্য তাহা দ্বারা কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পাটভক্ত্যাকে কাঁধে লইয়া জনতা মন্দিরের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তারপর তাহাকে কাঁধে লইয়াই বাহকেরা সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিল।

এইবার পাটশুদ্ধ ভক্ত্যাকে ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বারে নামাইয়া রাখিল। 'শরশয্যা' হইতে উঠিয়া প্রথমেই পাটভক্ত্যা সাষ্টাঙ্গ হইয়া মন্দিরস্থ দেবতাকে প্রণাম করিল। শেষবারের মত উচ্চরব করিয়া বাদ্যভাণ্ড নীরব হইল। পাটভক্ত্যা ও অন্যান্য ভক্ত্যাগণ তখন 'জলযোগ' করিবার অনুমতি লাভ করিল। তাহারা চলিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণ জনশূন্য হইয়া গেল।

উপরে পাটপূজার যে বর্ণনা দেওয়া গেল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বর্তমান কালে ইহা প্রাচীনতর রীতি শালে ভর দেওয়ার প্রতীক্ (token) মাত্র রূপে ব্যবহৃত হইলেও পূর্বকালে ইহা এক অত্যন্ত কঠোর রীতি ছিল। কৃষিকার্যের সহায়ক ও কৃষিসম্পদ বৃদ্ধির জন্য সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর আদিম সমাজে নরবলি দেওয়া হইত। আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর আদিম সমাজের সূর্যদেবতা ব্যতীত কেহই নহেন। আমি একথাও বলিয়াছি যে, হিন্দুপ্রভাব-বশতঃ আদিবাসীর কৃষি-সহায়ক সূর্যদেবতা প্রথমতঃ ধর্ম-ঠাকুর এবং পরে শিবঠাকুররূপে পরিবর্তিত হইয়াছেন। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন কোনও লৌকিক শিবমন্দিরে আদিম সূর্যোপাসনারই কতকগুলি আচার পালন করা হইয়া থাকে। শালে ভর, কাঁটাঝাঁপ, বাণফোঁড়া ও চড়ক তাহাদের অন্যতম। উপরোক্ত পাটপূজার মধ্যেও তাহার অন্যতম নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য পাটের উপর লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া একদিন আদিম সমাজে যে নরবলি দেওয়া হইত, পাটপূজার মধ্যে এখনও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দামড়ার ধর্মঠাকুর

বর্ধমান জিলায় আসানসোল সহর হইতে তিন মাইল দূরবর্তী দামোদর নদের তীরে দামড়া নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে এই গ্রামে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস—ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাউরী পর্যন্ত প্রায় সকল জাতির লোকই এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। গ্রামের সর্বপ্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানই বৈশাখ পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন। দুর্গা পূজা কিংবা কালী পূজা এই গ্রামে কদাচিৎ অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু এই গ্রামে ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক গাজন উপলক্ষে যে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা হয় না।

গ্রামে একটি সুগঠিত ইষ্টক নির্মিত ধর্মরাজ মন্দির আছে—তাহার চারিদিক ঘিরিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, মন্দিরের সম্মুখে একটি অতি প্রাচীন তেঁতুল গাছ। সহজেই বুঝিতে পারা যায়, ধর্মঠাকুরের জন্য মন্দির নির্মিত হইবার পূর্বে তিনি এই বৃক্ষ-তলেই অবস্থান করিতেন। এখনও পশ্চিম বঙ্গের বহুগ্রামে ধর্মশিলা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কিংবা বৃক্ষতলেই অবস্থান করিয়া থাকেন। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক কোণে ষাটুতলা বা ষষ্ঠীতলা নামক একটি স্থান আছে। সেখানে সিন্দুর লিপ্ত দুইখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ষষ্ঠীর দিন গ্রামের মেয়েরা এখানে সমবেত হইয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া থাকে। বার মাসে যে বার রকমের ষষ্ঠীর পূজা হয়, তাহাদের প্রত্যেকটি উপলক্ষেই যে তাহারা এখানে পূজা লইয়া আসে, তাহা নয়—কেবল বিশেষ কোন পূজা উপলক্ষে তাহাদিগকে এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেইজন্য স্থানটি অনাদৃত ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতেই বৎসরের বেশীর ভাগ সময় পড়িয়া থাকে।

ধর্মরাজ মন্দিরটি বড় সুন্দর। এমন সুদৃঢ় ও সুগঠিত মন্দির এই অঞ্চলে আর নাই। পঞ্চকোটের কাশীপুর রাজপ্রদত্ত দেবোত্তর জমির উপর এই মন্দির পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রামবাসিগণ কাশীপুররাজের বদান্যতার কথা এখনও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিয়া থাকে। তারপর কি ভাবে যে সেই কাশীপুররাজ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সিপাহীদলের নেতৃত্ব করিবার ফলে অন্যান্য বহু মৌজার সহিত তাঁহার এই অঞ্চলের মৌজাটিও হস্তচ্যুত

করেন, সে কথাও গ্রামবাসী আজও বিস্মৃত হয় নাই। বর্তমানে এই মন্দিরটি কাশীমবাজারের জমিদারীভুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্গত। কি ভাবে যে কাশীপুররাজের নিকট হইতে এই অঞ্চল কাশীমবাজারের জমিদার পরিবারের হস্তগত হইল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন লোক-শ্রুতি এখনও এই অঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোক-শ্রুতির মূলে ঐতিহাসিক উপাদান থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজায় পূর্বে কাশীপুররাজের নামে সঙ্কল্প হইত, এখন কাশীমবাজারের নামেই সঙ্কল্প হয়।

মন্দিরের মধ্যস্থ 'সিংহাসনে' তিনটি ধর্মশিলা পাশাপাশি অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনটিই ডিম্বাকৃতি, কূর্মাকৃতি নহে। প্রত্যেকটি ধর্মশিলার উপরি-ভাগ শ্বেত চন্দন দ্বারা লিপ্ত থাকে। ঠাকুরের মাথা যাহাতে স্নিগ্ধ থাকে, সেইজন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, ধর্মশিলা সূর্যদেবতার প্রতীক্। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে সূর্যতেজ প্রশমিত করিয়া কৃষিকার্যের সহায়ক জলবায়ু সৃষ্টি করিবার জন্য এই লৌকিক প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্যবস্থাকেই ইংরেজিতে Sympathetic magic বলে। শিলাখণ্ডের উপবিভাগ শ্বেত চন্দন লিপ্ত, কিন্তু নিম্নভাগ রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত। রক্তবর্ণ সূর্যতেজের প্রতীক। ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে নানাভাবে রক্ত বর্ণের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক কল্পনা করা হইয়াছে। যাই হউক, তিনটি শিলাখণ্ডের তিনটি নাম—বাঁকুড়া রায়, বুড়া রায় ও কালা রায়। এই তিনটি ধর্মশিলার উৎপত্তি সম্পর্কে তিনটি স্বতন্ত্র জন প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহা উল্লেখ করিতেছি। বাঁকুড়া রায় নামে ধর্মশিলাটিকে এক আঁকড (আকন্দ ?) গাছের নীচ হইতে কুড়াইয়া পাওয়া যায়। সেইজন্যই ইহার সম্পর্কে বলা হয়, 'আঁকড়া তলার বাঁকডা রায়।' কিন্তু কে কবে কোথাকার আঁকডা নামক অপরিচিত কোন গাছের নীচ হইতে ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছিল, সত্যই কেহ কোনদিন পাইয়াছিলই কি না, তাহা সঠিক এখন আর কেহই বলিতে পারে না। দ্বিতীয় ধর্মশিলার নাম বুড়া রায়। এই ধর্মশিলাটি ৮।৯ মাইল দূরবর্তী আখলপুর নামক এক গ্রামে পূজিত হইত। একবার বাৎসরিক গাজনের সময় দামড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের কলুজাতীয় দেয়াশীর উপর স্বপ্নাদেশ হইল যে, বুড়া রায়কে আখলপুর

গ্রাম হইতে যেন দামড়া গ্রামে লইয়া আসা হয়। সেই অনুসারে তাঁহাকে ভক্ত্যারা গিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু গাজনের পর যখন আখল পুরের গ্রামবাসী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আসিল, তখন তাহারা শুনিল যে, পূর্বদিন রাত্রে স্বপ্নাদেশ হইয়াছে, তিনি এ' গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না, তদবধি দামড়াবাসিগণ তাঁহাকে নিজেদের গ্রামে রাখিয়া দিয়া নিজেদের ধর্মশিলার সঙ্গে তাঁহারও নিয়মিত দৈনিক ও বাৎসরিক পূজা করিতেছে—ধর্মশিলাটিকে আর কোনদিন আখলপুর যাইতে দেয় নাই। আখলপুরের অধিবাসিগণ আর কোনও দিন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনও আগ্রহ দেখায় নাই।

তৃতীয় ধর্মশিলাটির নাম কালু রায়। ইনি এক মাইল দূরবর্তী চেলাই নামক গ্রামে নিয়মিত পূজিত হইতেন। কিন্তু ক্রমে গ্রামের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইতে থাকে, বহু লোক কর্মের সন্ধানে গ্রামত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। অবশিষ্ট গ্রামবাসী ইহার পূজা আর চালাইতে পারিতেছিল না। তারপর একদিন ইহাকে মাথায় করিয়া আনিয়া দামড়া গ্রামের ধর্মমন্দিরে রাখিয়া যায়, আর কোনদিন ফিরাইয়া লইতে আসে না। অগত্যা দামড়া গ্রামের অধিবাসিগণ ইহাকেও নিজেদের ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে স্থান দিয়া নিয়মিত পূজা করিয়া আসিতেছে। একজন গ্রামবৃদ্ধ বলিলেন, এক বছর আগে চেলাই গ্রামের অধিবাসিগণ মহাধূমধাম করিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়াছে, কিন্তু তাহারা ধর্মশিলা কোথা হইতে পাইল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না—তাহাদের নিজেদের গ্রামের ধর্মশিলা তাহারা এই উপলক্ষেও ফিরাইয়া লইতে আসে নাই।

এই সকল কাহিনী সত্য বলিয়া মনে করা কঠিন। তিনটি ধর্মশিলাই দেখিতে সম্পূর্ণ অনুরূপ। বুড়া রায় আকারে একটু ক্ষুদ্র হইলেও গঠন ভঙ্গিতে অভিন্ন। বাঁকুড়া রায় ও কালা রায় আকৃতিতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিভিন্ন সময়ে আনীত ধর্মশিলা হইলে ইহাদের আকৃতি ও গঠন ভঙ্গিতে এমন ঐক্য থাকিবার কথা নহে। মনে হয়, তিনটি ধর্মশিলার এক সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা। তিন সংখ্যার একটি ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বলিয়া পৃথিবীর বহু আদিম জাতিই বিশ্বাস করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস হইতেই

তিনটি ধর্মশিলার এখানে প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধ ত্রিশরণের পরিকল্পনাও তিনসংখ্যা সম্পর্কিত এই আদিম সংস্কারেরই ফল—অতএব এই তিনটি ধর্মশিলার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মুখ্য কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

দামড়া গ্রামে উক্ত তিনটি ধর্মশিলারই নিত্য পূজা হয়। নিত্য পূজায় পশু বলি হয় না ; মানসিক অনুসারে বাৎসরিক পূজায় প্রতি বৎসর শতাধিক পাঁঠা বলি হয়। যে নিত্য পূজা করে, তাহাকে দেয়াশী বলা হয়। দেয়াশী কলু জাতির লোক। বর্তমানে এই গ্রামে কলুদের বংশ লোপ পাইয়াছে, দুই এক ঘর শেষ পর্যন্ত ছিল, তাহারা নিকটবর্তী অন্য এক গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। দেয়াশী সেখান হইতেই নিত্য যাতায়াত করিয়া দেবতার পূজা করিয়া থাকে। গ্রামের কোনও ব্রাহ্মণ যদি পূজা দিতে আসে, তবে কলু দেয়াশীর পরিবর্তে হাজরা উপাধিধারী গ্রামের একজন উচ্চবর্ণ হিন্দু পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু কলু দেয়াশী তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয় না ; কারণ, এ পূজায় যে তাহারই আইনতঃ অধিকার তাহা কেহ অস্বীকার করে না ; কলু দেয়াশীকে তাহার প্রাপ্য না দিলে পূজার ফল পাওয়া যাইবে না বলিয়া সকলেই মনে করিয়া থাকে। সরকারী কাগজ পত্রে কলুদেরই দেবতার সেবাইৎ বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তাহারাই দেবতার নামে প্রদত্ত জমি ভোগ করিয়া থাকে। দেবতার নামে বহু জমি আছে—বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে কতক জমি ইজারা বিলিও করা হইয়াছে। বাৎসরিক গাজনের সময় ইজারা জমির খাজনা আদায় করা হইয়া থাকে।

ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজায় বিশেষ আড়ম্বর হইয়া থাকে। বার্ষিক পূজার নির্দিষ্ট দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। পূর্বে পূর্ণিমার নয়দিন পূর্বেই 'ভক্ত্যা কামান' হইত। 'ভক্ত্যা কামান' শব্দের অর্থ পূজায় মানসিক করিয়া যাহারা ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসী হয়, তাহাদের ব্রত উদ্‌যাপনের সূত্রপাত। ব্রত আরম্ভ করিলেই কেবলমাত্র ফলমূল ও দুগ্ধ পান করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে এই সকল জিনিষ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইবার ফলে পূজার নয়দিন পূর্বে ভক্ত্যা হইবার রীতিও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন ৫।৬ দিন পূর্ব হইতে 'ভক্ত্যা কামান' হইয়া থাকে। যেদিন হইতে ভক্ত্যাদিগের ব্রত পালন আরম্ভ হয়, সেদিন

প্রথমই তাহাদের ক্ষৌরকার্য করিয়া লইতে হয়। সেইজন্যই এই অনুষ্ঠানের নাম ভক্ত্যা কামান। যাই হউক, সেইদিন ভক্ত্যাগণ মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া তাহাদের সঙ্কল্প দেয়াশীর নিকট ব্যক্ত করে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষেই ভক্ত্যা হইবার অধিকার আছে—যতদিন পর্যন্ত তাহারা ভক্ত্যার ব্রত পালন করে, ততদিন দেবকার্যে সকলেরই সমানাধিকার স্বীকৃত হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকল জাতিই ভক্ত্যা হইয়া থাকে—সৎগোপ ও বাউরী ভক্ত্যা হইলে সমপর্যায়-ভুক্ত হয়। ভক্ত্যাদিগকে প্রথন দিনেই মন্দির হইতে একগাছি করিয়া সূতা দেওয়া হয়, ইহাকে উতুরী বা উত্তরীয় বলে। ভক্ত্যাগণ ইহা মালার মত করিয়া গলায় পরিয়া থাকে। বাঁকুড়া জিলার ধর্ম কিংবা শিবের গাজনে এই উপলক্ষে প্রত্যেক ভক্ত্যার হাতেই একখণ্ড বেত দেওয়া হয়। এখানে সে রীতি প্রচলিত নাই। উতুরী ধারণ করিলে প্রত্যেক ভক্ত্যাই ব্রাহ্মণের মর্যাদালাভ করিয়া থাকে। তাহারা দেবতাকে স্পর্শ করিয়া থাকে এবং অন্যান্য দেবকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার পায়।

যেদিন ভক্ত্যা কামান হয়, সেদিন হইতেই ভক্ত্যাদিগের হবিষ্যি আরম্ভ হয়। মাতৃপিতৃদশায় যেমন হবিষ্যি পালন করিবার রীতি প্রচলিত আছে, ইহাতেও তাহাই পালন করিতে হয। পূজার আগের দিন হবিষ্যি ত্যাগ করিয়া ফলদুধ খাইতে পায়।

পূজার দিন অর্থাৎ বৈশাখ পূর্ণিমার দিনে সন্ধ্যার পূর্বেই গ্রাম-গ্রামান্তরের অধিবাসিগণ দেবতার নিকট প্রদীপোহার লইয়া আসে। সন্ধ্যার পর মন্দিরের মধ্যে গ্রামবাসীর প্রদত্ত প্রদীপগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। আলোক-মালায় মন্দিরের অভ্যন্তর ঝলমল করিতে থাকে। পূজার দিনে প্রত্যেক গ্রামবাসী ধর্মঠাকুরের নামে উপবাস পালন করিয়া থাকে, প্রত্যেকেরই গৃহ হইতেই সেই দিন পূজোপকরণ মন্দিরে পাঠাইয়া দেওযা হয়—তৎসঙ্গে এক বা একাধিক তৈল ও সলিতা সহ মাটির প্রদীপও থাকে। ধর্মরাজঠাকুরকে প্রদীপোপহার দেওয়ার রীতি সর্বত্র প্রচলিত নাই। ইহা এই মন্দিরের একটি অত্যন্ত প্রাচীন রীতি বলিয়া মনে হয়। ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতার প্রতীক্, প্রদীপগুলিও সূর্যতেজের প্রতীক্ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূজার তিন চারি দিন পূর্ব হইতেই ধর্মশিলা তিনটিকে একবার করিয়া

মন্দির হইতে বাহির করিয়া সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেদীর উপর স্থাপন করা হয়। পুনরায় প্রত্যহই ইহাদিগকে মন্দিরের ভিতরে সিংহাসনে লইয়া রাখা হয়। ইহাকে 'বারাম' বলে। 'বারামে'র ঢাকের শব্দে গ্রামবাসী মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রতিদিন সমবেত হয়। কাজটি নিতান্ত সহজ নহে। লোকের বিশ্বাস, দেবতা মন্দির ছাড়িয়া বাহির হইতে চাহেন না এবং যাহাতে কেহ তাহাকে মন্দির হইতে বাহির করিতে না পারে, সে জন্য তিনি ওজনে, ভারি হইতে থাকেন। 'অতি কষ্টে' ভক্ত্যা তাঁহাকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আসিবার পথেও বার বার দেবতা পিছনের দিকে মন্দিরের ভিতরে চলিয়া যাইতে চাহেন। ভক্ত্যা তাঁহাকে লইয়া যদি এক পা অগ্রসর হয়, তখনই আবার দুই পা' পিছাইয়া যায়। এই অভিনয় বহুক্ষণ চলিতে থাকে। সমবেত জনতা করযোড়ে মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই 'দেব-লীলা' প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। উচ্চরবে আট দশখানি ঢাক বাজিতে থাকে। ঢাকের শব্দে দামোদরের অপর তীর পর্যন্ত প্রকম্পিত হইতে থাকে।

মাতৃত্বের ক্ষুধা

বাৎসরিক পূজার পূর্বদিন মন্দিরে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়—তাহার নাম 'লাপ্‌ড়া ভাঙ্গা'। বাঁকুড়া ও মানভূম জিলার অনেক ধর্মমন্দিরেই ইহা পালন করা হইয়া থাকে। বিষয়টি একটু বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। ভক্ত্যাগণ পূর্ব হইতেই বড় বড় কন্টিকারি (এক প্রকার সকণ্টক বৃক্ষ)-র ঝাড় মন্দির প্রাঙ্গণে আনিয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেকে দুই হাতের মুঠিতে দুইটি ঝাড় লইয়া পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পরস্পরকে তাহা দ্বারা আঘাত করিতে করিতে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে। ইহা একটি কৃত্রিম যুদ্ধ বা mock fight-এর রূপ ধারণ করে। ঢাকের তালে তালে নৃত্যপর ভক্ত্যাদের উত্তেজনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে থাকে ; অতএব অনেক সময় তাহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতি-পক্ষকে আঘাত করে—আঘাতের ফলে কোন কোন সময় ভক্ত্যাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, তাহা হইতে রক্ত ঝরিতে দেখা যায়, কিন্তু দেবকার্য বিবেচনা করিয়া ভক্ত্যাগণ দৈহিক যন্ত্রণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করে না। এইভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া নৃত্য চলিতে থাকে ; সমবেত জনতা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া ভক্ত্যাদের এই 'দেব-লীলা' পরম ভক্তিভরে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। ঢাকের শব্দে চারিপাশের পাঁচ ছয়খানি গ্রাম প্রকম্পিত হইতে থাকে। নৃত্য শেষ হইয়া গেলে ভক্ত্যাগণ কাঁটার ঝাড়গুলি মন্দিরের সম্মুখে আনিয়া গদির মত করিয়া সাজাইয়া রাখে। তারপর পাট ভক্ত্যা বা প্রধান ভক্ত্যা তাহার উপর দিয়া নগ্নগাত্রে একবার গড়াগড়ি দিয়া চলিয়া যায়। অন্যান্য ভক্ত্যারাও একজনের পর একজন করিয়া তাহাকে অনুসরণ করে। সমবেত জনতা চারিদিক ঘিরিয়া করজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এক একজন ভক্ত্যা কাঁটার গদির উপর দিয়া গড়াইয়া চলিয়া যাইবা মাত্র, তাহারা ধর্মরাজঠাকুরের নাম উল্লেখ করিয়া এক-একবার উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠে। উল্লাস-ধ্বনির সময় ঢাকের শব্দ মৃদুতর হয়, সমবেত মনুষ্যকণ্ঠের জয়ধ্বনি তখন আকাশভেদী হইয়া উঠে। এই অনুষ্ঠানের নামই 'লাপ ড়া ভাঙ্গা'। ধর্মশিলার স্নানোৎসব

ধর্মরাজঠাকুরের বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। আমি পূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে ধর্মশিলা আদিম সমাজের পরিকল্পিত সূর্য-দেবতার প্রতীক্। সূর্যদেবতার প্রতীক্‌কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করাইবার মধ্যে আদিমজাতিসুলভ একটি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। ইংরাজীতে ইহাকে sympathetic magic অথবা imitative magic বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে, প্রধানতঃ গ্রীষ্মকালে, সূর্য যখন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়া কৃষিকার্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশঙ্কার সৃষ্টি করে, তখন তাহাকে প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার একটি প্রতীক্ পরিকল্পনা করিয়া তাহা পুকুর কিংবা নদীর জলে নিমজ্জিত করা হয়। ইহা হইতেই আদিম সমাজ মনে করিত যে, অবিলম্বে সুবৃষ্টি হইয়া কৃষিকার্যের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। ধর্মশিলার অনুষ্ঠানিক স্নানোৎসবের মধ্যেও এই আদিমজাতিসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে কণারকের সূর্য সংস্কৃতির (Solar culture) বহু উপাদান আসিয়া মিশ্রণ লাভ করিয়াছে। সেইজন্য গ্রীষ্মশেষে, অথবা বর্ষার প্রারম্ভে অনুষ্ঠিত জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা বা স্নানোৎসব তাহাতে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ধর্মশিলার স্নানোৎসবের নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে ইহারই একটি লৌকিক রূপের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বাৎসরিক পূজার নির্দিষ্ট দিনে ভক্ত্যাগণ একটি ধর্মশিলাকে পাল্‌কিতে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে স্নান করাইবার জন্য গ্রামের একটি পুকুরে লইয়া যায়। গ্রামের বিশেষ একটি পুকুর এই কার্যের জন্য নির্দিষ্ট আছে। গ্রামের অন্যান্য পুকুরের অবস্থা ইহা হইতে অনেক ভাল হইলেও, যে পুকুরটি এই উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সেই পুকুর ব্যতীত এই কার্য নিষ্পন্ন হইবার উপায় নাই। অতএব মনে হয়, এই পুকুরটিই গ্রামের প্রাচীনতম পুকুর এবং একদিন ইহাই সমগ্র গ্রামের লক্ষ্যস্থল ছিল। তিনটি ধর্মশিলার মধ্যে যদি বাঁকুড়া রায়কে স্নানার্থ মন্দির হইতে বাহির করা হয়, তবে তাঁহাকে পুকুর ঘাটে লইয়া যাওয়ার পরিবর্তে অদূরবর্তী দামোদর নদে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার কারণ সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে, বাঁকুড়া রায় দামোদর নদ হইতেই উঠিয়াছিলেন, সেইজন্য বৎসরে একবার করিয়া তাঁহাকে দামোদরের জলে স্নান করাইয়া আনা হয়। কিন্তু দামোদর নদ গ্রাম্ হইতে

একটু দূরবর্তী এবং সেখানে যাতায়াত একটু কষ্টসাধ্য বলিয়া গ্রামের পক্ষ হইতে বিশেষ কোন দাবি না থাকিলে বাঁকুড়া রায়কে মন্দির হইতে স্নানার্থ বাহির করা হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাঁকুড়া রায়ই এই গ্রামের আদি ধর্মশিলা এবং গ্রামে যখন কোন পুকুর কিংবা বাঁধ ছিল না, তখনই বাঁকুড়া রায়ের প্রতিষ্ঠা এব' পূজার সূত্রপাত হয়। তারপর জনবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পুকুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কালক্রমে নূতন ধর্মশিলা আসিয়া মন্দিরে স্থান লাভ করিয়াছে, তখন হইতেই নূতন প্রথার প্রবর্তন হইয়াছে।

যাহা হউক, যে ধর্মশিলাকেই স্নানার্থ মন্দির হইতে বাহির করা হয়, তাহারই পশ্চাতে বিরাট বাদ্যভাণ্ড অগ্রসর হইতে থাকে। পালকির মধ্যে ধর্মশিলাটিকে স্থাপন করিবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। একটি বাঁশের ঝুড়ির মধ্যে কিছু আতপ চাউল রাখা হয়, আতপ চাউলের উপর ধর্মশিলাটি স্থাপন করিয়া ঝুড়ি ও আতপ চাউলসহ তাহা পালকির মধ্যে স্থাপন করা হয়। তারপর ভক্ত্যাগণ পাল্‌কি কাঁধে করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পুকুর ঘাটে আসিয়া পাল্‌কি হইতে ঝুড়িটি নামাইয়া ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী তাহা ধরাধরি করিয়া লইয়া মধ্য পুকুরের দিকে অগ্রসর হয়। মন্দিরের পুরোহিতের সহকারীকে ধামাৎকন্নি বলে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মন্দিরের যে প্রধান সেবায়েৎ তাহাকেই দেযসী বলা হয়। ধামাৎকন্নি, দেয়াসী এবং পুরোহিত সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হইয়া মন্দিরের দেব-সভায় নিজেদের অধিকার স্থাপন করিয়াছে। এই মন্দিরের ধামাৎকন্নি অস্পৃশ্য হিন্দু দেয়াসী কলুজাতীয় এবং পুরোহিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। মন্দির হিন্দু জমিদারের পৃষ্ঠপোষিত হইবার ফলে তাহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অধিকার জন্মিলেও পূর্ববর্তী কালে ইহার উপর যাহাদের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের বংশধরগণও ইহার উপর হইতে তাহাদের দাবী পরিত্যাগ করে নাই। দেব-শিলা স্পর্শ করিবার অধিকার পর্যন্ত তাঁহারা এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছে। পশ্চিম বাংলার যে সকল গ্রামে ব্রাহ্মণের অধিকার অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে ব্রাহ্মণেতর নিম্নজাতি গ্রাম্য দেবতার মন্দিরে কোনও প্রকার কর্তৃত্ব করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণ গ্রামের

নিম্নতম জাতি পর্যন্ত দেবমন্দিরের সঙ্গে যে সমান সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

যাই হউক, ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী ঝুড়িটি লইয়া মধ্য পুকুরের দিকে অগ্রসর হয়। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম—বৈশাখ পূর্ণিমা; অতএব পুকুরের গভীরতম অংশেও বুকজলের বেশী জল থাকে না। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী ঝুড়িটি ধরিয়া লইয়া সেইখানে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়। যখন ইহারা উভয়ে ঝুড়িটি পাল্‌কি হইতে নামাইয়া লইয়া পুকুরের জলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে। এই অঞ্চলের সাধারণ লোকের বিশ্বাস ধর্মঠাকুরের স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু' যদি কোনও বন্ধ্যা নারী নিজের মাথায় ধারণ করিতে পারে, তবে সেই নারী সেই বৎসরের মধ্যে অবশ্যই সন্তানসম্ভবা হইবে। দামড়ার ধর্মঠাকুরের এই মাহাত্ম্যের কথা কেবলমাত্র যে এই গ্রামের মধ্যেই প্রচারিত আছে, তাহা নহে—আশে পাশের দশ বারোখানি গ্রামের লোক দামড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের এই মাহাত্ম্যের কথা অবগত আছে। সেইজন্য সেই সকল গ্রামের বিভিন্ন বয়সের বন্ধ্যা নারীগণ এই গ্রামের ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার দিন আসিয়া এখানে সমবেত হয়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতার প্রতীক্—আদিম সমাজে সূর্যই উৎপাদন শক্তির মূল কেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হয়—এই উৎপাদন অর্থে পৃথিবীর শস্যোৎপাদনও যেমন বুঝায়, নারীর সন্তানোৎপাদনও তেমনই বুঝায়। পৃথিবী এবং নারী উভয়েই সূর্যের শক্তি দ্বারাই একজন শস্যোৎপাদন ও আরেক জন সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস। বাংলা দেশে বিশেষতঃ ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে হিন্দুপ্রভাব বশতঃ আদিম সমাজের এই সূর্য দেবতাই শিব-রূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন; সেইজন্য এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েরা শিবপূজা করিয়া নারীজীবন সার্থকতার উপায় সন্ধান করিয়া থাকে। যাই হউক, দামড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের স্নানোৎসবটির মধ্যে আদিম সমাজের ধর্মবোধের যে কিছু পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী যখন ধর্মশীলা সহ ঝুড়িটি লইয়া পুকুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সমবেত জনতা হইতে বন্ধ্যা নারীগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া জলে নামিয়া পড়ে। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী মধ্য

পুকুরের দিকে যখন অগ্রসর হইয়া যায়, তাহারাও তখন মধ্য পুকুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া ঝুড়িটি ঘিরিয়া দাঁড়ায়। মাতৃত্বের কাঙ্গালিনী শত শত বন্ধ্যা নারী ধামাৎকন্নি ও দেয়াসীকে বার বার অনুরোধ করিতে থাকে যে, ঝুড়িটি জল হইতে উঠাইবামাত্র যেন তাহাদের দিকে আগাইয়া দেওয়া হয়। সকলেই একসঙ্গে এই অনুরোধ জানাইতে থাকে—অতএব কোলাহল ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই শুনা যায় না। তার'র ধর্মঠাকুরের নামে জয়োল্লাস করিয়া ধামাৎকন্নী ও দেয়াসী যখন ঝুড়িটি জলে চুবাইবার উদ্যোগ করে, তখন বন্ধ্যা নারীগণ পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া ঝুড়িটির যথাসম্ভব নিকটে আসিয়া মাথা পাতিয়া রাখে। এই ঠেলাঠেলিতে ঝগড়া বিবাদের যে সৃষ্টি না হয়, তাহা নহে—অনেক সময় গ্রাম্য ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে নীচ গালাগালি করিতে শুনা যায়; ধর্মঠাকুর যদি পাষাণরূপী না হইতেন, তাহা হইলে এই গালাগালি শুনিয়া তাঁহাকে দুই হাতে কান রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইত।

যাই হউক, বহু আয়োজন উদ্যোগের পর ধামাৎকন্নি ও দেয়াসী এইবার ধর্মশিলা ও পূর্বোক্ত আতপ চাউল সহ ঝুড়িটি মুহূর্তের জন্য মাত্র পুকুরের জলে চুবাইয়া ধরে—আবার সেই মুহূর্তেই তাহা জল হইতে উপরে উঠাইয়া লয়। ঝুড়ি হইতে সহস্র ধারায় জল নীচে ঝরিয়া পড়িতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে সন্তানলোভাতুরা বন্ধ্যানারীগণ সেই ঝুড়ির নীচে মাথা পাতিয়া দিয়া ধর্মঠাকুরের 'স্নানজলে'র আশীর্বাদ মাথা ভরিয়া গ্রহণ করিতে থাকে। ধামাৎকন্নি ও দেয়াসীকে চারিদিক হইতে অতিকষ্টে এই জনতার বেগ রোধ করিতে হয়, তীরে দাঁড়াইয়া গ্রামবৃদ্ধগণ নানাপ্রকার সতর্ক উপদেশবাণী বর্ষণ করিতে থাকেন, কিন্তু বিভিন্ন বয়সী বন্ধ্যা নারীদের ঝগড়া বিবাদ ও কোলাহলের মধ্যে সকলই কোথায় তলাইয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ধর্মঠাকুরের স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু' যে মাথায় ধারণ করিতে পারিবে, সেই নারী বৎসরের মধ্যেই সন্তানবতী হইবে। কিন্তু স্নানজলের এই 'প্রথম বিন্দু' যে ঝুড়ির কোন ছিদ্র পথে কখন উধাও হইয়া যায়, তাহার কেহই সন্ধান পায় না। তথাপি তাহারই প্রত্যাশায় বৎসরের পর বৎসর অসংখ্য বন্ধ্যা নারী এখানে আসিয়া সমবেত হয়। প্রতি বৎসরই তাহাদের নিরাশ হইতে হয়, তথাপি একটি আশা লইয়া তাঁহারা বাঁচিয়া থাকে যে একদিন এই ধর্ম-

ঠাকুরের স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু'র প্রসাদ তাঁহারা লাভ করিবে। প্রতাপচন্দ্র মিশ্র গ্রামের একজন প্রবীণ ব্যক্তি ; ৭৬ বৎসর বয়সেও তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট রহিয়াছে। তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রায় চতুর্দশ পুরুষ যাবৎ তিনি এই গ্রামের অধিবাসী। তিনি নিঃসন্তান, তিনি নিজের মুখেই বলিলেন, তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা। তাঁহার স্ত্রী কোনদিন ধর্মঠাকুরের স্নান জলের এই 'প্রথম বিন্দু' লাভ করিবার জন্য কোন রকম চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইবার জন্য সংক্ষেপে বলিলেন,—'মেয়েদের কথা মেয়েরা বলিতে পারে, আমরা তাহাদের কথা কেমন করিয়া বলিব ?' তিনি তাঁহার স্ব-গ্রামের ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বোধ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকিলেও নিজের জীবনের এই ব্যর্থতার জন্য দেবতাকে দায়ী করিতে চাহেন না।

বন্ধ্যা নারীদের মাথায় ঠাকুরের স্নানজল বিতরণের পালা চলিবার সঙ্গে সঙ্গে 'নিয়ম কলসী' পূর্ণ করা হয়। একটি নূতন 'মাটির কলসী' পুকুরের জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে কয়েক বিন্দু ধর্মঠাকুরের স্নানজল মিশ্রিত করা হয়। তাহাকেই নিয়ম কলসী পূর্ণ করা বলে। মন্দিরে দেবকার্যে এই জল সংবৎসর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'নিয়ম কলসী' স্নানজল পূর্ণ করিবার একটি বিশেষ রীতি আছে। পাটভক্ত্যা পূর্ব হইতেই কলসীটি পুকুরের জলে পূর্ণ করিয়া বন্ধ্যা নারীদের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের মধ্যে ধর্মশিলার অনুগমন করে। তারপর যখন ধামাৎকন্নী ও দেয়াসী ধর্মশিলাকে ঝুড়িতে চুবাইয়া উপরে তুলিয়া ধরে, সেই সময় বন্ধ্যা নারীদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করিয়া পাটভক্ত্যা ধর্মঠাকুরের স্নানজলের কয়েকটি বিন্দু কলসীতে পূর্ণ করিয়া লয়। স্নানজলের 'প্রথম বিন্দু' কলসীতে পূর্ণ করা তাহারও লক্ষ্য ; কারণ, তাহা হইলে নিয়ম কলসীর জল বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া মনে করা হয় এবং স্নানজলের প্রথম বিন্দু-ধৃত নিয়ম কলসীর জল বন্ধ্যা নারীর সন্তানোৎপাদন শক্তির অধিকারী হয়। যাই হউক, নিয়ম কলসীতে স্নানজলবিন্দু মিশ্রিত করিবা মাত্র পাটভক্ত্যা কলসীটি লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে পুকুর ঘাট হইতে ধর্মঠাকুরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার কারণ, পথিমধ্যে কোনও অপদেবতার দৃষ্টিতে সেই জল ইহার ঐন্দ্রজালিক (magic) শক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে ;

দেব-মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিলে সে ভয় আর থাকে না। পাটভক্ত্যা বলিল, অপদেবতার দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া আজকাল বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য 'নিয়ম কলসী'র জলে পূর্বের মত আর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, পূর্বে এই জলে চোখ ধুইলে অন্ধেরও দৃষ্টি ফিরিয়া আসিত ইত্যাদি।

স্নানের পালা শেষ হইবার পর পুনরায় ধর্মশিলা ও ধৌত আতপ চাউল সহ ঝুড়িটি পাল্‌কীতে আনিয়া তোলা হয় এবং ভক্ত্যাগণ তাহা কাঁধে করিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বাদ্যভাণ্ড পূর্ববৎ পশ্চাদনু-সরণ করে।

'ফুল খেলা'

পূর্ব হইতেই শত শত গ্রামবাসী মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। তাহাদের অধিকাংশেরই হাতে এক বা একাধিক প্রদীপোপহার, সঙ্কল্প করিবার জন্য সিদ্ধ ধানের চাউল এবং নৈবেদ্যের জন্য আতপ চাউলের এক একটি পুটুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত আছে—একটি প্রদীপোপহার ও অপরটি সঙ্কল্পের জন্য সিদ্ধ ধানের চাউল ব্যবহার। হিন্দুর দেবপূজায় দেবতাকে ধূপ ও প্রদীপোপহার দিবার রীতি প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু বারোয়ারী পূজায় গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক প্রদীপ দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দিবার রীতি অন্যত্র প্রচলিত নাই। যদিও ধর্মঠাকুর সর্বত্রই সূর্যদেবতার প্রতীকই ছিলেন এবং সেই সূত্রেই সূর্যের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে প্রদীপ উপহার দিবার প্রথার উদ্ভব হইয়াছে বলিযা মনে হয়, তথাপি বর্ধমান জিলার এই অঞ্চলে আর একটি ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথাও কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না—তাহা জৈন ধর্মের প্রভাব। এ কথা সকলেই জানেন, জৈন তীর্থঙ্করদিগের নির্বাণ লাভের তিথিটিকে জৈনধর্মাবলম্বিগণ আলোকোৎসব রূপেই পালন করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে জৈন মন্দিরগুলি আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। বর্ধমান জিলার যে অংশের কথা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে, সেই অংশে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষাও প্রবলতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দামোদর নদের দুই তীরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবমন্দিরগুলিই তাহার প্রমাণ। তাহা ছাড়াও জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বহু পরিচয় এই অঞ্চলের বিস্তৃত ধর্মমন্দিরগুলির ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব এ'কথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, দামড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে দেবতার নামে প্রদীপোপহার উৎসর্গ করিবার রীতিটি যে এত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার মূলে জৈন ধর্মেরই প্রভাব কার্যকর হইয়াছে। দ্বিতীয় বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ—তাহা দেবতার নামে সঙ্কল্প করিতে সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার। সকলেই জানেন, দেবকার্যে সিদ্ধ চাউল কদাচ ব্যবহৃত হইতে পারে

না। কারণ, হিন্দু সংস্কার ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধান সিদ্ধ হইলেই অপবিত্র হইয়া যায়। অতএব আতপ চাউলই দেবকার্যে সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজায় দুই এক জায়গায় ইহার ব্যতিক্রম আমি নিজেই লক্ষ্য করিয়াছি। বর্ধমান সহর হইতে দামোদর নদের অপর তীরে ক্ষুদকুড়ি নামে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে এক উগ্রক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে একটি ধর্মশিলা নিত্য পূজিত হইয়া থাকে—প্রতিদিন তাহাকে এক সের সিদ্ধ ধানের চাউলের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষের নিকট ধর্মঠাকুরের এই প্রকারই স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল যে ধর্মঠাকুর আতপ চাউল আহার করিয়া তৃপ্তি পান না, তাঁহাকে যেন সিদ্ধ ধানের চাউলেরই নৈবেদ্য দেওয়া হয়—সেই অনুসারে এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এ'কথা আজকাল সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই প্রকার স্বপ্নাদেশ সম্পূর্ণ অর্থহীন, ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাঙ্গালী সিদ্ধ চাউলের অন্নভোজী, অতএব বাঙ্গালীর নিজস্ব ঘরের দেবতাকে সে আতপ চাউল ভোজন করাইয়া তৃপ্তি পায় না, নিজে সে যাহা আহার করে, তাহাই সে দেবতাকে নিবেদন করে ; নিজে যাহা আহার করে না, যাহার স্বাদ জানে না, দেবতাকে তাহা উপহার দিয়া সে প্রবঞ্চনা করিতে চাহে না। অতএব এই আচারটির ভিতর বাঙ্গালীর অধ্যাত্মবোধের একটি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

যাই হউক, ধর্মশিলাকে পাল্‌কিতে করিয়া মন্দিরে লইয়া আসিবার পর ভক্ত্যাগণ কৃচ্ছ্র সাধনার নানা পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। সমগ্র গ্রামবাসীর পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়া দাঁড়ায়। দেবকার্যে কত যে, অসাধ্য সাধন করা যাইতে পারে, নিরক্ষর গ্রামবাসী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম বিস্ময় বোধ করিয়া থাকে।

ধর্মঠাকুরের পাল্‌কিটি লইয়া যখন জনতা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন একদল ভক্ত্যা জনতার অগ্রবর্তী হইয়া পুকুর ঘাট হইতে মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছায়। মাটিতে লুটাইয়া এই দুরূহ কার্যটি সাধন করিতে হয় বলিয়া ইহাকে 'লোটন' বলে। যে সকল ভক্ত্যা ইহাতে অংশ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে লোটন ভক্ত্যা বলে। তাহাদের সর্বাঙ্গের ধূলি গ্রামবাসিগণ নিজেদের গায়ে লইয়া মাখে, জাতিবর্ণ-

নির্বিশেষে তাহাদের স্পর্শকেও সকলেই পরম পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্ত্যাগণ অস্পৃশ্য জল-অনাচরণীয় জাতি হইতেই অধিক সংখ্যায় আসিয়া থাকে, কিন্তু এই দেবকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের এই অস্পৃশ্যতা দূর হইয়া যায়, সেই সময়ের জন্য তাহারা উচ্চতম বর্ণের মর্যাদা লাভ করে। বাংলাদেশের সুদূর পল্লী অঞ্চলে বর্ণাশ্রম ধর্ম যে আপনার সমুচ্চ আদর্শ সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই, এই সকল লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠান হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ নিজের জাত্যাভিমান ভুলিয়া গিয়া অন্ত্যজের অঙ্গের ধূলি পরম পবিত্রজ্ঞানে নিজের দেহে মাখিয়া লয়।

'লোটন' শেষ হইলেই সাধারণতঃ 'ফুল খেলা' আরম্ভ হয়। যাঁহারা আনুপূর্বিক গাজনের অনুষ্ঠান কোনদিন লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহারা ফুলখেলা বলিতে কি বুঝায়, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন না। চোখে না দেখিলে বিষয়টির গুরুত্ব কেবল লিখিয়া বুঝাইতে পারা যাইবে না। তথাপি বিষয়টি সম্পর্কে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছি। মন্দির প্রাঙ্গণের এক অংশে কতকগুলি কাঠের অঙ্গার বহুক্ষণ যাবৎ আগুন জ্বালিয়া হাওয়া করিয়া রক্তবর্ণ করা হইয়া থাকে। ভক্ত্যাগণ মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দেবতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়ায়। একটি লোহার চিম্‌টা করিয়া এই জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি ভক্ত্যাদের এক হাতের তালুতে তুলিয়া দেওয়া হয়। এক হাতের তালুতে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি হাত পাতিয়া লইবামাত্র ভক্ত্যাগণ অপর হাতের তালুতে তাহা অর্ধ বৃত্তাকারে ফেলিয়া দেয়—পুনরায় তাহা প্রথম হাতের তালুতে লুফিয়া লয়। এইভাবে কেবলমাত্র দুই হাতের তালুর সাহায্যে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি এক হাত হইতে অপর হাতে, অপর হাত হইতে পুনরায় সেই হাতে লইতে থাকে। অন্ততঃ বিশ পঁচিশখানি বৃহদায়তন ঢাক দামোদরের দুই কূল প্রকম্পিত করিয়া বাজিতে থাকে। ইহাদের তালে তালে নাচিতে নাচিতে ভক্ত্যাগণ এইভাবে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি এক হাত হইতে অপর হাতের তালুতে লুফিয়া লুফিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার সময় কোন অঙ্গারখণ্ড যদি নিভিয়া যায় অর্থাৎ ইহার ভিতর হইতে জ্বলন্ত অগ্নিকণা নিঃসৃত হইতে যদি দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে ভক্ত্যা নিজেই সেই অঙ্গারগুলি মাটিতে ফেলিয়া দেয় এবং তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া তাহার করতল পুনরায় পূর্ণ

করিয়া দেওয়া হয়। নৃত্যের তালে তালে অঙ্গারগুলি হইতে জলন্ত অগ্নিকণা চারিদিকে তুবড়ীর আলোর মত ছড়াইতে থাকে, কখনও চলমান অঙ্গারগুলির মধ্য হইতে আগুণের কণা একটি অর্ধ বৃত্তাকার রেখার মত ফুটিয়া উঠে। দৃশ্যতঃ ইহার 'ফুল খেলা' নামটি পরম সার্থক। দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয়, যেন কোনও অগ্নিবর্ণ পুষ্প চারিদিকে নিজের রঙিন দলগুলি বিকীর্ণ করিতেছে। এইভাবে ভক্ত্যাগণ একবার, তিনবার কিংবা সাত বার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। বয়স এবং অভ্যাসের তারতম্য অনুসারে ইহার সংখ্যার পার্থক্য হইয়া থাকে। এই কার্যের পর ভক্ত্যাদিগের হাতের তালু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহাতে তাহাদের কোনও ক্ষতি হয় নাই। যাহারা সর্বদা হাতের কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের হাতের তালুর চামড়া যথেষ্ট পুরু থাকে সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারাই যে কি ভাবে প্রায় আধঘণ্টাকালীন অগ্নিস্পর্শের প্রতিক্রিয়া তাহারা বাঁচাইয়া চলে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভক্ত্যাদিগের বিশ্বাস, যথাবিধি নিয়ম পালন করিয়া এই দেবকার্য করিলে কাহারও কোনও অনিষ্ট হইতে পারে না।

তারপর ধর্মঠাকুরের মাথায় 'ফুল চাপানো'র পালা আরম্ভ হয়। 'ফুল চাপানো'র অর্থ দেবতার 'মাথায়' পদ্মফুল স্থাপন করা। গ্রামবাসিগণ এক একটি শ্বেতপদ্ম পুরোহিতের হাতে দিয়া তাহাদের নামে তাহা দেবতার মাথায় স্থাপন করিতে বলে। এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া এক একটি ফুল চাপানো হইয়া থাকে। যদি চাপাইবামাত্র ফুলটি পড়িয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, যে-ব্যক্তি যে-উদ্দেশ্যে ফুল চাপাইয়াছে, তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মঠাকুর একটি শিলাখণ্ড মাত্র—'মাথা' বলিয়া তাহার কিছু নাই। ইহার উপরিভাগটিকে যদি মাথা বলিযা ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তাহা এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহাতে পদ্মফুলের মত একটি বড় জিনিস রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইতে বাধ্য। ফুলটি পড়িয়া গেলে পুরোহিতের পক্ষেও লাভ এই যে, গ্রামবাসী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশানুরূপ দক্ষিণা দিবে; অতএব ফুল চাপাইবামাত্রই পড়িয়া থাকে, কোনদিন আটকাইয়া থাকিতে শুনা যায় না।

সমাজের একটি নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক কার্যেও ফুল চাপানোর রীতিটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রামে কাহারও ঘরে কোনও জিনিস চুরি গেলে

যদি কাহাকেও সন্দেহ হয়, তবে তাহার নাম করিয়া ফুল চাপানো হয়—যদি ফুল পড়িয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নির্দোষ—দোষী হইলে ফুল পড়িবে না। পূর্বেই বলিয়াছি, ফুল কখনও আটকাইয়া থাকিতে শুনা যায় না, অতএব ইহা দ্বারা দোষী নির্দোষ নিরূপণ করা সম্ভব হয় না, তবে ফুল চাপানোর ভয়ে যে ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হয়, সে প্রকৃতই দোষী হইলে তৎক্ষণাৎ অপহৃত দ্রব্য ফিরাইয়া দিয়া যায়—এ'রূপ ঘটনা গ্রামে অনেক ঘটিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

বাৎসরিক পূজার পরের দিন দুপুরের দিকে তিনটি ধর্মশিলাকেই গ্রামের প্রান্তবর্তী একটি পুকুরে পুনরায় স্নানার্থ লইয়া যাওয়া হয়। এই স্নানের তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে উৎসব উপলক্ষ্যে জনসাধারণ ধর্মশিলা কয়টিকে স্পর্শ করিয়া যে 'অপবিত্র' করিয়াছে, স্নান দ্বারা তাহাদের শোধন করা হয়। কারণ, এইবার সর্বসাধারণকে ধর্মশিলার সন্নিকটবর্তী হইতে দেওয়া হয় না, কিংবা জনসাধারণও সেদিন ধর্মশিলা স্পর্শ করিবার কেনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াও মনে করে না। কিন্তু সেদিন ধর্মশিলা কয়টিকে স্নানার্থ লইয়া যাইবার স্বতন্ত্র একটি প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে; তাহা এই—দুইটি ধর্মশিলা দুইটি রাধাচক্রের মত নির্মিত 'যন্ত্রে' স্থাপন করিয়া দুইজন ভক্ত্যা ইহাদিগকে বুকের উপর লইয়া বসে; অন্যান্য ভক্ত্যাগণ রাধাচক্রারূঢ় ধর্মশিলাধারী ভক্ত্যা দুইজনকে কাঁধে করিয়া লইয়া পুকুর ঘাটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যায়। আর একজন ভক্ত্যা, সাধারণতঃ পাটভক্ত্যা, আর একটি ধর্মশিলা বুকের উপর স্থাপন করিয়া পাট বা কাঠের উপর বিদ্ধ লৌহ-শলাকার উপর শয়ন করে, অন্যান্য ভক্ত্যাগণ পাটশুদ্ধ ভক্ত্যাকে কাঁধে করিয়া পুকুর ঘাট পর্যন্ত লইয়া যায়। পশ্চাতে বাদ্যভাণ্ড চলিতে থাকে, খর রৌদ্রে দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতা দূর করিয়া বাদ্যধ্বনি দামোদরের অপর তীরে গিয়া প্রতিহত হয়। পুকুর তীরে গিয়া সমবেত জনতার সম্মুখে একদিকে ধামাৎকর্মি ও পুরোহিত ধর্মশিলা কয়টিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করাইতে থাকে, অপর দিকে ভক্ত্যাগণ বাণফোড়া জিভফোড়া প্রভৃতি দেখাইতে থাকে। বহুক্ষণ যাবৎ এই অনুষ্ঠান চলিতে থাকে, গ্রীষ্মের বেলা অবসন্ন হইয়া আসে। তখন ভক্ত্যাগণ ধর্মশিলা কয়টিকে পূর্ববৎ মন্দিরের দিকে লইয়া রওনা হয়। কেহ

কেহ পায়ে ঘুঙুর বা নূপুর পরিয়া জনতার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হয়। মন্দির-প্রাঙ্গনে আসিয়া পৌঁছিয়া ধর্মশিলা কয়টিকে সোজাসুজি মন্দিরের ভিতর লইয়া আসিয়া বেদীর উপর স্থাপন করা হয়—বৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে আর মন্দিরের বাহিরে আনা হয় না। ইতিপূর্বেই মন্দির-প্রাঙ্গণে এক বিরাট মেলার অধিবেশন হয়, চারিপাশের পঁচিশ ত্রিশখানি গ্রামের লোক তাহাতে আসিয়া সমবেত হয়, তাহাতে আজকাল নানা রকম সস্তা বিদেশী জিনিস কেনা বেচা হয়। সেইদিনই ভক্ত্যাদের 'উতুরী' খুলিয়া দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 'নিয়ম-ভঙ্গ' হয়, অর্থাৎ তাহাদিগকে আর কোনও নিয়ম পালন করিতে হয় না, তাহাদের দেব-কার্যের আর কোনও অধিকার থাকে না। কিন্তু অনুষ্ঠান সেদিনই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া যায় না, তাহার পরদিনের জন্যও একটি অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম 'ধর্মযজ্ঞ'। তাহা এই—সে'দিন ভক্ত্যাগণ মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া ধর্মরাজ ঠাকুরের নামে দুইটি পাঁঠা বলি দেয়, তারপর গ্রামের সম্পন্ন লোকদিগের নিকট হইতে নগদ চাঁদা কিংবা চাউল ও বাঁধের মাছ সংগ্রহ করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণেই উনুন কাটিয়া রান্না করে। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতেও সেদিন অনেক আসিয়া সেখানে সমবেত হয়। ব্রাহ্মণ পাচক রান্না করে,—'যার পাত, তার ভাত' এই নীতি অনুযায়ী আব্রাহ্মণ সকল জাতি পাতা পাড়িয়া বসিযা এক সঙ্গে আহার করে, ভোজনে কোনও পংক্তি বিচার হয না। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বাৎসরিক অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পূর্বেই বলিযাছি, দামড়ার ধর্মরাজ ঠাকুরের বিস্তৃত দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। এই দেবোত্তর সম্পত্তি যাহারা ভোগদখল করে, তাহারা তাহার বিনিময়ে ধর্মরাজ ঠাকুরকে বাৎসরিক একটা খাজানা দিয়া থাকে। এই খাজনা আদায় করিবার প্রণালীর মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার এক মাস পূর্ব হইতেই মন্দির-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, কিংবা সে বছর যাহারা ভক্ত্যা হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারা প্রতি সন্ধ্যায় একটি পাট মাথায় করিয়া যাহারা ধর্মঠাকুরের জমি ভোগদখল করে তাহাদের গৃহের প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হয়, পাটটি মাথা হইতে মাটিতে নামাইয়া রাখে। গৃহস্থ বধূগণ ধূপ দীপ জ্বালিয়া পাটটির পূজা করে এবং গৃহস্থগণ যে যাহার দেয়

খাজনা তাহার নিকট আনিয়া রাখে। এই খাজনার কোনও দাখিলা কিংবা রসিদ দিতে হয় না, পুরুষানুক্রমিক এই রীতি চলিয়া আসিতেছে, কোনদিন এই লইয়া কোনও বিবাদ বিসম্বাদও হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। এই ভাবে যে খাজনা আদায় হয়, তাহাই বাৎসরিক পূজার ব্যয়ের মূল ভিত্তি। গ্রামবাসী এই উপলক্ষ্যে যে চাঁদা দিয়া থাকে, তাহা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়; বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্গতির দিনে তাহাদের নিকট হইতে ইহার বেশী কিছু আশাও করা যায় না।

বাৎসরিক পূজা ব্যতীতও মন্দিরে যে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, তাহার জন্য মন্দিরের দৈনিক প্রণামীর উপরই নির্ভর করিতে হয়। নিত্যপূজা দেয়াসী ও ধামাৎকন্নি কোনমতে নির্বাহ করে। দামড়ার ধর্মমন্দিরের ধামাৎকন্নি একজন হাজরা পদবীবিশিষ্ট উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি। তাঁহার প্রধান কাজ, বার্ষিক পূজা উপলক্ষে জল-অনাচরণীয় যে সকল জাতি মন্দিরে পূজা লইয়া আসে, তাহাদের নিকট হইতে পূজা লইয়া দেবতার বেদীর উপর স্থাপন করা, তারপর তাহাদের ভোগনৈবেদ্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া। কলুজাতীয় দেয়াসী নিত্যপূজা করিয়া থাকে; যেদিন দেয়াসী আসিতে পারে না, সেদিন ধামাৎকন্নিই পূজা নির্বাহ করিয়া দেয়। কাহারও মানসিক বিশেষ পূজা থাকিলে কোন কোন সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরও আবির্ভাব হয়—নতুবা সমস্ত বৎসর মন্দিরে তাঁহার আর দেখা পাওয়া যায় না।

চড়ক ধর্মপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ; কারণ, চড়ক আদিম সূর্য পূজারই একটি আচার। দামড়ার অধিবাসিগণ বলিয়া থাকে যে, পূর্বে ধর্মপূজা উপলক্ষ্যে এখানেও চড়ক হইত; কত পূর্বে যে তাহা হইত, তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারে না; কেহ যে তাহা কোনদিন দেখিয়াছে, তাহাও মনে হইল না; তথাপি গ্রামের সকলেই বলিয়া থাকে যে, একদিন এই মন্দির প্রাঙ্গণে চড়ক হইত, শত শত ভক্ত্যা প্রতি বৎসর চড়কে উঠিয়া চক্রাকারে শূন্যে ঘুরিত। কিন্তু একবার একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর হইতে তাহা বন্ধ হইয়াছে। একবার যখন নিয়মিত চড়কের অনুষ্ঠান হইতেছে এবং সেই উপলক্ষে একজন ভক্ত্যা চড়কে উঠিয়া শূন্যমার্গে চক্রাকারে দ্রুতবেগে ঘুরিয়া যাইতেছে, সেই সময় সহসা চড়কগাছের উপরকার যে একটি সরু কাঠি

লম্বমান বৃহত্তর কাষ্ঠখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখে, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হইল—ফলে তৎক্ষণাৎ সেই ভক্ত্যার মৃত্যু হইল। গ্রামবাসীর বিশ্বাস এই ভক্ত্যা যথারীতি নিয়ম পালন না করিয়াই চড়কগাছে আরোহণ করিয়াছিল, সেইজন্যই ধর্মঠাকুর তাঁহাকে এই শাস্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, তারপর হইতেই দামড়ার ধর্মরাজ মন্দিরে চড়ক বন্ধ হইয়াছে। ইহার পুনঃ প্রবর্তণের জন্য কোনও প্রয়াস আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ঘটনাটি যতদিন পূর্বেই সংঘটিত হউক না কেন, ইহার মূলে যে সত্যতা আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়; কারণ, অনুরূপ ঘটনার পর পশ্চিম বঙ্গের বহু ধর্মমন্দিরেই চড়ক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চড়কের অনুষ্ঠানে কৃচ্ছ্রসাধনার উপর যে জোর দেওয়া হয়, তাহা হইতেই নানা দুর্ঘটনারও সৃষ্টি হইয়া থাকে—একবার কোনও দুর্ঘটনা হইলে অনুরূপ অনুষ্ঠান দেবতার অভিপ্রেত নহে বলিয়াও মনে করিয়া অনেক গ্রামবাসী তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হিন্দুধর্মে ছুৎমার্গ এই সকল গ্রামাঞ্চলে যে কিভাবে কার্যকর হইয়া থাকে, তাহারও একটি পরিচয় এই অনুষ্ঠান হইতে পাওয়া যায়। পূর্বে যে 'নিয়ম কলসী'র কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার জল একজন জল-অনাচরণীয় জাতির লোক বিতরণ করিয়া থাকে। এই জলের ঐন্দ্রজালিক শক্তি (magic power) আছে, বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাউরী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই সমানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে—হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের ছুৎমার্গ নীতি এখানে কোনও দিক দিয়া কার্যকরী হয় না। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণগণ যে সকল অঞ্চলে নিম্নতম জাতির সংস্রবে অসিয়াছেন, সেখানে দুইটি নীতি সাধারণতঃ অবলম্বন করিয়াছেন—প্রথমতঃ ব্রাহ্মণেতর সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের চারিদিকে এক নিশ্ছিদ্র প্রাচীর রচনা করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণেতর সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণগণ প্রথমোক্ত এবং বাংলার পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ দ্বিতীয়োক্ত সমাজের অধিবাসী। ধর্মঠাকুরের নিয়ম কলসীর জলের সঙ্গে দেবতার ভোগরূপে প্রদত্ত চিনি ও বাতাসা মিশ্রিত করিয়া জল সর্বসাধারণের মধ্যে প্রধানতঃ কলু দেয়াসীই বিতরণ করিয়া থাকে—দেবতার মন্ত্রপূত জল বিবেচনা করিয়া সকলে তাহা পান করিয়া মস্তকে ধারণ

করে—সেই দেবতা কে, কোন মন্ত্র দ্বারা তাহা কে পূজা করিয়াছে এই প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না।

পূর্বে বলিয়াছি যে বৎসরের মধ্যে দেবতাকে আর কোনদিন মন্দিরের বাহির করা হয় না। বিশেষ কারণে কচিৎ তাহার ব্যতিক্রমও হয়—তবে সে রকম কারণ গ্রামে সচরাচর বড় ঘটিতে দেখা যায় না। অনাবৃষ্টিই কৃষিজীবী পল্লী-বাসীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুর্বিপাক। অনাবৃষ্টির সময় কোন কোন বৎসর ধর্মঠাকুরের নিকট 'জুড়িভোগ' দেওয়া হয়। কোন কোন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরকে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আনিয়া কিছুকাল রাখিয়া যে শাস্তিভোগ করান হয়, এখানে সে রীতি প্রচলিত নাই। 'জুড়িভোগ' অর্থে পায়েস ভোগ। এই পায়েস মন্দির প্রাঙ্গণেই উনুন কাটিয়া রান্না করা হয়; তারপর দেবতাকে তাহা নিবেদন করার পর মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত লোকদিগের মধ্যেই বিতরণ করা হয়। ব্রাহ্মণ পাচক তাহা রান্না করে এবং ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জাতিই মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহা দেবতার প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

দামড়া গ্রামে আরও যে কয়েকটি-দেব-স্থান আছে, তাহাদের মধ্যে ষষ্ঠীতলাই সব প্রথম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাহার নির্দিষ্ট কোন মন্দির নাই। ধর্মতলার বিস্তৃত প্রাঙ্গণের সংলগ্ন একটি বন্য বৃক্ষের নীচে দুইটি সিন্দুর লিপ্ত ভগ্ন জৈন মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই গ্রামের ষষ্ঠীতলা। বার বাসের বাররকম ষষ্ঠীর পূজা উপলক্ষ্যে কিংবা জাতকের ষষ্ঠ দিবসে সাধারণতঃ উচ্চবর্ণের গ্রাম্য মহিলাগণ সেখানে পূজা দিতে আসেন; গ্রামের নিম্নজাতির জনসাধারণের সঙ্গে ইহার কোনও যোগ নাই—সেই জন্য ইহার উপর অবজ্ঞা ও অবহেলার ছাপ স্পষ্ট হইয়া আছে। গ্রামে কোনও বারোয়ারী মনসাতলা নাই—কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে পারিবারিক পূজা হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত প্রতাপচন্দ্র মিশ্র মহাশয়ের বাড়ীতে মনসাপূজা হয় না, কিন্তু চট্টরাজ ও হাজরা পদবী বিশিষ্ট হিন্দু পরিবারে শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিনে সিজ মনসার ডাল পুতিয়া মনসার পূজা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রায় সকল নিম্নজাতির গৃহেই কোন কোন সময় মনসার প্রতিমা নির্মাণ করিয়াও পূজা হইয়া থাকে—কিন্তু মনসা-পূজা এই অঞ্চলে তেমন প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হইল।

উৎপত্তি

পশ্চিম বঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে এই ধর্ম-ঠাকুরের পূজার প্রচলন আছে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা কেবলমাত্র সমাজের বিশেষ একটি স্তরে আবদ্ধ নাই —বরং তাহার পরিবর্তে ইহা সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সমানভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। অনেক সময় নিরক্ষর মুসলমান এবং সাঁওতালগণও ইহার কোন কোন আচারে অংশ গ্রহণ করে। হিন্দুধর্মের উপকরণ সমূহ সাধারণতঃ বাহির হইতে আসিয়া এই দেশের সমাজের উপর জুড়িয়া বসিয়াছিল, সেইজন্য তাহা এই দেশের সাধারণ অধিবাসীদিগের মধ্যে সুদৃঢ় শিকড় গাড়িয়া তুলিতে পারে নাই, কিন্তু ধর্মপূজা গোড়া হইতেই এই দেশের সাধারণ সামাজিক স্তর হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে উচ্চতর সমাজেও প্রসারিত হইয়াছিল বলিয়া, এই অঞ্চলে ইহার শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। রাঢ়ের প্রায় সর্বত্রই ধর্মপূজা দুর্গাপূজা হইতেও উৎসাহোদ্দীপক।

পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্রই যে ধর্মপূজা প্রচলিত আছে তাহা নহে, প্রধানতঃ এইভাবে ইহার সীমা নির্দেশ করা যাইতে পারে—উত্তরে সাধারণতঃ বীরভূম জেলার উত্তর সীমা, পূর্বে ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার প্রায় মধ্যবর্তী অঞ্চল ও পূর্বে মানভূম জেলার সদর মহকুমা সাঁওতাল পরগণা জেলার পূর্ব্ব সীমানা। এই অঞ্চল সাধারণতঃ রাঢ় নামে পরিচিত— উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ় ইহারই অন্তর্ভুক্ত। এই বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যেই ধর্মপূজা ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া বর্তমান থাকিলেও ইহার সংলগ্ন কোন কোন অঞ্চলে, যেমন ভাগীরথী নদীর পূর্ব অঞ্চলের কোন কোন অংশেও ইহা প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহার নিজস্ব অঞ্চল বহির্ভূত প্রদেশে স্বভাবতঃই ইহার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশিষ্ট প্রকৃতির ধর্মপূজা উক্ত নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ধর্মদেবতার নামটি বাংলার প্রায় সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। মধ্য ও তৎপূর্ববর্তী যুগে সকল শ্রেণীর হিন্দুর সঙ্গে যখন উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল, তখনই দেবতার নামটি পশ্চিমবঙ্গের উপরোক্ত অঞ্চল হইতে উত্তর ও

পূর্ববঙ্গে প্রচারলাভ করিয়াছিল, কিন্তু এই সকল অঞ্চলে ধর্মপূজা প্রচলিত হইবার মৌলিক কারণ সমূহ বর্তমান ছিল না বলিয়া এখানে ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট পূজা-পদ্ধতিটি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মধ্যযুগের উচ্চবর্ণের যে সকল বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কবি উক্ত রাঢ় অঞ্চল হইতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের রচনায় প্রসঙ্গতঃ কোন কোন স্থানে ধর্মদেবতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের দুই স্বতন্ত্র সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া ধর্ম ঠাকুর নিজস্ব পরিচয় হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং স্থানীয় প্রভাব স্বীকার করিয়া কোথাও শিব, কোথাও বা নাথগুরু রূপে পরিচিত হইয়াছেন—প্রকৃতপক্ষে ধর্মপূজার মৌলিক ধারার সঙ্গে ইহাদের কোন প্রকার যোগ রক্ষা পায় নাই। সেইজন্য পূর্ব বঙ্গে ধর্ম বলিতে শিব ও উত্তর বঙ্গে ধর্ম বলিতে অনেক সময় নাথ সম্প্রদায়ের আদি গুরুকে বুঝায়—রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুর বলিলে যাহা বুঝায়, এই দুইটি অঞ্চলে ধর্ম বলিতে তাহা বুঝায় না।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মপূজার সীমা নির্দেশ করিতে গিয়া উপরে যে অঞ্চলের কথা কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সর্বত্রই যে ধর্মপূজা একই অভিন্ন প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও নহে। যে অঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রভাব অধিক, সেই অঞ্চলে ইহা স্বভাবতঃই হিন্দুধর্মের পূজা-পদ্ধতি দ্বারা সেই পরিমাণেই প্রভাবিত হইয়াছে, যে অঞ্চলে এই প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প সেই অঞ্চলে বরং ইহার মৌলিক পরিচয়টি স্পষ্টতর বলিয়া অনুভব করা যায়। উক্ত রাঢ় অঞ্চল এক-কালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, অতএব যে অঞ্চলে ইহাদের প্রভাব অধিকতর ছিল সেই অঞ্চলে ধর্মপূজার উপরও ইহাদের প্রভাব সেই পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছে। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম যে একই সময়ে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বর্তমান ছিল তাহাও নহে, তাহা হইলে ধর্ম পূজার উপর এক এক অঞ্চলে ইহাদের এক একটিরই প্রভাব অনুভূত হইত। কিন্তু ধর্মপূজার একই মৌলিক ভিত্তির উপর জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রভাব সমূহ পর্যায়ক্রমে কার্যকর হইয়াছিল, তাহারই ফলে ধর্মপূজার বর্তমান উপকরণ সমূহ বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্য হইতে ইহার লৌকিক উপাদান ব্যতীত জৈন বৌদ্ধ ও হিন্দু উপকরণ সমূহেরও সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইবে। ধর্মপূজা

এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক উপাদানকে আত্মস্থ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া হিন্দুধর্মের প্রবল স্রোতের মুখেও ইহার নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আজিও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই।

উপরি বর্ণিত অঞ্চলে ধর্মঠাকুর নামক যে দেবতার পূজা হইয়া থাকে, তাহার কোন মূর্তি বা প্রতিমা নাই—একখণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তর তাঁহার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কোন স্থানে এই প্রকার একাধিক প্রস্তর-প্রতীকও পূজিত হয়, তবে তিন সংখ্যক প্রস্তরখণ্ডই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সময় এই সকল প্রস্তরখণ্ডের গায়ে এক এক টুকরা চাঁচ লাগাইয়া রাখা হয়, তাহা ধর্মঠাকুরের চক্ষু বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কোন ব্যক্তি চক্ষুরোগগ্রস্ত হইলে সে ধর্ম ঠাকুরের নিকট মানসিক করিয়া থাকে যে, সে আরোগ্য লাভ করিলে ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট সংখ্যক চাঁচের টুকরা উপহার দিবে। রোগ মুক্তির পর সে সেই পরিমাণ চাঁচের টুকরা লইয়া গিয়া মন্দিরে উপহার দিয়া আসে, পুরোহিত সেই টুকরাগুলিকে প্রস্তরখণ্ডের গায়ে লাগাইয়া রাখে, ক্রমে প্রস্তর-খণ্ড হইতে ইহা খসিয়া পড়িয়া যায়। যে অঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রভাব বেশি সেই অঞ্চলে প্রস্তরখণ্ডটিকে কূর্মাকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে ; কারণ, সেই অঞ্চলে ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হন এবং বিষ্ণুর এক অবতার কূর্ম। কিন্তু প্রস্তরখণ্ডগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে কূর্মের আকৃতি নয়—ইহারা সাধারণতঃ সুগোল, ডিম্বাকৃতি (oval) কিংবা ত্রিকোণাকৃতি। মোট কথা, ইহাদের নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বলিলেই চলে ; ইহার কারণ মূলতঃ প্রস্তরখণ্ড উদ্দিষ্ট দেবতা ছিলনা ; দেবতা ছিল অন্য— প্রস্তরখণ্ড তাহার প্রতীকরূপে মাত্র ব্যবহৃত হইত, কিন্তু কালক্রমে মূল দেবতার কথা সকলে বিস্মৃত হইয়া গিয়া তাহার প্রতীকটিকেই প্রকৃত দেবতা বলিয়া পূজা করিতে লাগিল। তখনই প্রস্তরখণ্ডের আকৃতিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি প্রস্তরখণ্ডটির উপর কোনরূপ যন্ত্রাদি প্রয়োগ করিয়া ইহার স্বাভাবিকত্ব কদাচ নষ্ট করা হয় না—ইহাকে সুনির্দিষ্ট কোন আকারে পরিণত করিবারও কোন প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জন্য এক এক ধর্মমন্দিরে ধর্মশিলাটির এক এক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বীরভূম জিলার বেলেগ্রামে যে প্রসিদ্ধ ধর্ম ঠাকুর আছেন তাহার মূর্তি একটি ভগ্ন প্রস্তর

নির্মিত দেব মূর্তির নিম্নভাগ মাত্র। কালাপাহাড় মূর্তিটি ভাঙ্গিয়াছেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য রচয়িতা একজন কবি বাঁকুড়া জিলার গোপালপুর গ্রামের একটি ধর্ম ঠাকুরকে 'কাঁকড়াবিছা ধর্ম ঠাকুর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বলাবাহুল্য প্রস্তরখণ্ডটি দেখিতে কাঁকড়াবিছার আকৃতি বলিয়াই ইহাকে কাঁকড়াবিছা ধর্মঠাকুর বলা হইয়াছে। এই কবিই ধর্মঠাকুরের বন্দনা করিতে গিয়া তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, যে ধর্ম-ঠাকুরের "স্থানে স্থানে মূর্তিভেদ" আছে, অর্থাৎ তিনি সুনির্দিষ্ট কোনরূপে কোথাও বিরাজ করেন না। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার আদিম অদিবাসীদিগের মধ্যে তাহাদের Supreme God, ধর্মেশ, 'ধরমদেওতা' 'ডেরম্ম' ইত্যাদি কথার প্রচলন আছে, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝাইতে আকাশস্থ সূর্যদেবতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না, তাহাদের মধ্যে এই সূর্যের কোন প্রতীক্ পূজারও ব্যবস্থা নাই।

সাধারণতঃ এই সকল প্রস্তররূপী ধর্মঠাকুরগণ পল্লীর কোন নির্জন বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া থাকেন, কোন প্রয়োজন না হইলে সাধারণতঃ কেহ তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। কিন্তু গ্রামে যদি অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তখন গ্রামবাসীগণ সমবেত হইয়া বৃক্ষমূলেই গিয়া বিধি অনুযায়ী তাহার পূজা দিয়া থাকে। কেহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভুগিতে থাকিলে ব্যক্তিগত ভাবেও তাহার নিকট মানসিক করিয়া থাকেন—রোগমুক্তি হইলে ভক্ত মহা ধুমধাম সহকারে পূজার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন—তাঁহার অবস্থা যদি স্বচ্ছল হয় তবে তিনি সেই বৃক্ষের সংলগ্নই তাঁহার জন্য 'মন্দির' গড়িয়া দিয়া থাকেন—এই মন্দির তাহার সঙ্গতি অনুযায়ী মাটি, খড় কিংবা ইটদ্বারাও নির্মিত হইতে পারে। হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চলের কোন কোন স্থানে ধর্মশিলা শালগ্রাম শিলার মত গৃহেও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহার নিত্য পূজার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পূজাচারের মধ্যে অহিন্দু উপকরণও বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্ধমান জিলায় দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে খুদকুড়ি নামক গ্রামে এক উগ্র ক্ষত্রিয়ের (আগুরি) বাড়ীতে এক ধর্মঠাকুর আছেন—তাহাকে প্রত্যহ এক সের সিদ্ধ চাউলের নৈবেদ্য দিয়া ভোগ দেওয়া হয়। হিন্দু পূজাচারে সিদ্ধ চাউল অস্পৃশ্য,

কিন্তু এই সম্পর্কে উক্ত উগ্র ক্ষত্রিয়ের গৃহে যে কিংবদন্তীটি প্রচলিত আছে তাহা এই—

একদিন সন্ধ্যাকালে বাড়ীর গৃহিণী পুকুর ঘাটে চাউল ধুইতে লইয়া যান। হাত দিয়া ধুচনীর মধ্যে চাউল রগ্‌ড়াইতেছেন এমন সময় হাতের মধ্যে একখণ্ড পাথর ঠেকিল, তিনি পাথরটিকে হাতে লইয়া দূর করিয়া পুকুরের জলে ছুঁড়িয়া দিয়া পুনরায় চাল ধুইতে লাগিলেন। কিন্তু পুনরায় পাথরটি হাতে আসিয়া ঠেকিল। এইবারও তিনি তাহা ছুঁড়িয়া দিলেন। তিনবার এই প্রকার করিবার পরও যখন চতুর্থবার একই উপায়ে ইহা আসিয়া আবার হাতে ঠেকিল তখন তিনি অগত্যা পাথরটিকে হাতে করিয়া লইয়াই গৃহে ফিরিলেন। তিনি প্রস্তরখণ্ডটিকে আঙ্গিনার এককোণে ফেলিয়া রাখিয়া রান্না করিতে গেলেন— এই কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। রাত্রে ধর্মঠাকুর গৃহ-কর্তার সম্মুখে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, তিনি তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন, ঐ প্রস্তরখণ্ডটিই তার প্রতীক; তিনি তাঁহার গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য পূজা পাইতে চাহেন। গৃহকর্ত্তা করজোড়ে নিবেদন করিল, আমার গৃহে দেব-পূজার কোন ব্যবস্থা নাই—প্রত্যহ আতপ চাউল কোথায় পাইব? অতএব আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাও। কিন্তু দেবতা বলিলেন, আতপ চাউলের কোন প্রয়োজন নাই। প্রত্যহ এক সের সিদ্ধ চাউলের ভোগ দিলে চলিবে। তদবধি গৃহকর্তা সেই প্রস্তরখণ্ডটিকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যহ এক সের সিদ্ধ চাউলের ভোগ দিয়া তাহার পূজা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতই সেই পূজা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হাতে পড়িয়া অন্যান্য সকল বিষয়ে ধর্মশিলা শালগ্রামশিলা তথা বিষ্ণুর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে হিন্দুধর্মের বিস্তৃতির পূর্বে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল তখন এমনই ভাবে বুদ্ধের সহিত অভিন্ন হইয়া যে এই প্রকার বহু ধর্মশিলাই পূজিত হইতেন তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

এক এক গ্রামের ধর্মঠাকুর এক এক নামে পরিচিত। যেমন কালা রায়, বুড়া রায়, বাঁকুড়া রায় ইত্যাদি—রায় কথাটি প্রায় প্রত্যেক নামের অন্তেই যুক্ত রহিয়াছে। ধর্মঠাকুরের মহাত্ম্য রচয়িতা মধ্যযুগের একজন কবি তাঁহার পরিচিত ধর্মঠাকুরদিগের এইভাবে নাম উল্লেখ করিয়া বন্দনা করিয়াছেন,

প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর।
স্থানে স্থানে মূর্তিভেদ মহিমা বিস্তর॥
বেলডিহার বাঁকুড়া রায় বন্দি একমনে।
অসংখ্য প্রণতি শীতল সিংহের চরণে॥
ফুল্লরের ফতে সিং বৈতলের বাঁকুড়া রায়।
শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়॥
পাণ্ডুগ্রামের বুড়া ধর্মে বন্দিয়া সাদরে।
শ্যামবাজারের দলু রায়ে দিয়ে জয় জয়কারে॥
দেপুরে জগৎ রায়ে জোড় করি কর।
গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তারপর॥
সিয়াসের কালাচাঁদ ঞিদাসের বাঁকুড়া রায়।
বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায়॥
গোপুরের স্বরূপ নারায়ণ স্বর্ণ সিংহাসনে।
বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপনারায়ণে॥
পশ্চিম পাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া তাহায়।
বড়ুজা গ্রামের বন্দিব মোহন রায়॥
বড়ুছা গ্রামের বন্দি শীতল নারায়ণে।
আলগুড়চিন্নার খুদিরায়ে বন্দি সাবধানে॥
আকুটিবুল্লার মাল্লার ধর্মের করিযা স্তবন।
বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিয়া চরণ॥
জাড়াগ্রামের কালুরায়ে কামিন্যা সহিত।
জাজপুরের দেহারা বন্দি দার্ঢ্য করি চিত॥

অনেক সময় বিভিন্ন গ্রামের ধর্মঠাকুরদিগকে ভ্রাতৃসম্পর্কে আবদ্ধ বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। বীরভুম জিলার পুরন্দরপুরে যে ধর্মঠাকুর আছেন তিনি পার্শ্ববর্তী ধর্মঠাকুরদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া কল্পিত হন। বৎসরের মধ্যে একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের ধর্মশিলাদিগকে মাথায় করিয়া তাহাদের 'বড়দাদা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য লইয়া আসা হয়। এক মাঠের মধ্যে এই বাৎসরিক সাক্ষাৎকার ঘটে।

হিন্দুদেবতাগণ যেমন সাধারণ মঙ্গলবিধায়ক এই ধর্মদেবতাগণ ঠিক তেমন নহেন, যদিও কালক্রমে হিন্দুপ্রভাবিত অঞ্চলে তাঁহারা বর্তমানে সাধারণ হিতকারক বলিয়াও কীর্তিত হন, তথাপি তাহাদের বিশেষ কয়েকটি গুণের উপরই অধিক জোর দেওয়া হয়। তাহা এই নিঃসন্তানকে পুত্র-সন্তানদান, মৃতবৎসার সন্তাননাশ নিরোধ, অনাবৃষ্টির কালে সুবৃষ্টি দান, কুষ্ঠ ও চক্ষুরোগ হইতে পরিত্রাণ। ধর্মঠাকুরের এই গুণগুলির তাৎপর্য সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে।

পশুবলি ধর্মপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান হিন্দু-প্রভাবিত অঞ্চলে ছাগ ও কবুতরই বলি দিবার নিয়ম। ছাগের রঙ্ সাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অভাবে কৃষ্ণবর্ণ ছাগও চলিতে পারে। বাঁকুড়া জিলার বেলেতোড় গ্রামে এখনও সাদা ছাগ ভিন্ন বলি হয় না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ এই উপলক্ষে শূকর বলি দিত। এখনও বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী, বিশেষতঃ মানভূম অঞ্চলে এই উপলক্ষে শূকর বলি দিবার প্রথা বর্তমান আছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। মানসিক সিদ্ধ হইলে কোন কোন সময় ধর্মঠাকুরকে মাটির ঘোড়া উপহার দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল মাটির ঘোড়া ধর্মশিলার পার্শ্বে সজ্জিত করিয়া রাখা হয়, ক্রমে যখন ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যায় তখন বাহিরে মন্দিরের আঙ্গিনায় তাহা আনিয়া কোন স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়। পূর্ব কিংবা উত্তর বঙ্গে কোন দেবতা সম্পর্কেই এই রীতি অনুসৃত হইতে দেখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম-ঠাকুর হইতে এই রীতি অন্যান্য লৌকিক দেবতাতেও বিস্তৃতিলাভ করিযাছে সেইজন্য এই অঞ্চলে পথিপার্শ্বস্থ লৌকিক দেবস্থান সমূহে কোন কোন সময় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ধর্ম-ঠাকুর সাদা রঙের ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান। এই সম্পর্কে আর একটি বিশ্বাস এই যে, মাটির ঘোড়া উপহার পাইলে ধর্মঠাকুর ঘোড়ায় চড়িয়া ভক্তের আহ্বানে দ্রুত সাড়া দিতে আসিবেন ; আবার কেহ মনে করেন ধর্মঠাকুরকে মাটির ঘোড়া উপহার দিলে তাঁহার আশীর্বাদে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে সে ঘোড়ার মত হাসিয়া খেলিয়া দৌড়াইয়া বেড়াইবে।

ধর্মঠাকুরের পুরোহিত জাতিতে ডোম। ইহাদের পদবী পণ্ডিত।

যে গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সেই গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ডোম পূজারিগণ দেবতার উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার পরিত্যাগ করে না। বর্তমানে ডোম ব্যতীত অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতি, যেমন হাড়ি, কেওট বাগ্দী, প্রভৃতিও ধর্ম ঠাকুরের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চলে বর্তমানে অনেক সময় তাহারা ধর্মমন্দিরের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, এবং ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করে, কিন্তু বর্তমানেও প্রভাব বহির্ভূত অঞ্চলে ডোম জাতীয় লোকই পৌরোহিত্য ও তত্ত্বাবধান উভয় কার্যই করিয়া থাকে—ইহাতে অন্য কাহারও অধিকার আছে বলিয়া মনে করা হয় না। ধর্মমন্দিরের তত্ত্বাবধায়কদিগকে এই অঞ্চলে দ্যাশী বা দেয়াশী বলে। শব্দটি দেবদাসী (associate of God) বলিয়া কেহ মনে করিয়া থাকেন—মারাঠি 'দেশাই' শব্দটির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ধর্মঠাকুরের দেয়াশীগণ দেবতার নামে নানা প্রকার তুকতাক ঔষধ মাদুলী, জলপড়া প্রভৃতি দিয়া থাকে—লোকে কুষ্ঠরোগ, নানা প্রকার চর্মরোগ ও স্ত্রীলোকের বন্ধ্যারোগেই সাধারণতঃ ইহাদের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। যদি কাহারও ঔষধ কাজে লাগিয়া যায় তবে সেই মন্দিরস্থ দেবতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেয়াশীরও খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চলে একই মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ডোম অভাবে নিম্নশ্রেণীর কোন জাতির দেয়াসী থাকিতে পারে। কিন্তু দেবতার নামে তুক্তাক্ ঔষধ দেওয়ার ক্ষমতা দেয়াশী ভিন্ন অন্য কহারও নাই। বীরভূম জেলায় বেলিয়া বা বেলেগ্রামে (পোঃ আহম্মদপুর) এক ধর্মঠাকুর আছেন। ব্রাহ্মণ ইহার পুরোহিত, নিম্নজাতির লোক ইহার দেয়াশী। এ ধর্মঠাকুরের নামে যে বাত-বেদনার ঔষধ বিতরণ করা হয় তাহা পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চলের লোকই আসিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। বাত-বেদনায় ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ঔষধের বিনিময়ে দেয়াশী সমবেত রোগীদিগের নিকট হইতে দেবতার নামে দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকে ইহাতে প্রচুর আয় হয় দেখিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণও দেবতার নামে ঔষধ বিতরণ আরম্ভ করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিতে থাকে—ইহাতে দেয়াশীর ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়—তখন দেযাশী পুরোহিত ব্রাহ্মণের কোন ঔষধ দিবার অধিকার নাই দাবী করিয়া আদালতে নালিশ রুজু করে। আদালতের

বিচারে পুরোহিতের ঔষধ দিবার অধিকার স্বীকৃত হয়—তারপর হইতে পুরোহিত ও দেয়াশী দেবতার নামে উভয়েই ঔষধ বিতরণ করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিতেছে। দেয়াশী অগত্যা এক বিজ্ঞপ্তি পত্র প্রচার করিয়া "পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্ররোচনায়" না ভুলিবার জন্য রোগীদিগকে "সাবধান" করিয়া দিয়াছে। দেয়াশীর ব্যবস্থা মত "৺প্রভুজীউকে ১।০ টাকা কিংবা সাধ্যমত সওয়া পরিমাণ মানসিক করিয়া তৈল ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৺ধর্মরাজ প্রভুজিউ উদেশ্যে প্রণামাদি করিতে হয়। মুসলমানের পক্ষে গোমাংস খাওয়া নিষেধ।" এখানকার ধর্মঠাকুরের মন্দির প্রাঙ্গনের মৃত্তিকা বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রিত একপ্রাকর তৈল ভিঃ পিঃ যোগে দূরবর্তী স্থানেও পাঠান হইয়া থাকে। তৈলের মূল্য প্রতি সের কাঁচি ওজনের মূল্য তিন টাকা ও পাকি ওজনের ৪৲। এই ঔষধ "ধর্মরাজ ঠাকুরের স্বপ্ন প্রদত্ত" বলিয়া দাবী করা হয়।

এই সকল তুকৃতাক্ ঔষধ দেওয়ার ফলে দেয়াশীর অনেক সময় প্রচুর অর্থাগম হয় বলিয়া এখন বহু লোকই ধর্মঠাকুরের দেয়াশী হইতেছে, কিন্তু পূর্বে ডোম ভিন্ন কেহই যে ধর্মপণ্ডিত বা ধর্মের দেয়াশী হইতে পারিত না তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মানভূম জেলায় এখনও একটি প্রবাদ আছে,—"আর কোথাও জায়গা পেলেনা, শেষে ডোমের বাড়ীতে গিয়ে উঠলে, ধর্মরাজ!" এমন কি খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের একটি উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন পর্যন্তও বাংলাদেশে ডোমজাতির সঙ্গে ধর্মপূজার একমাত্র সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে করা হইত; তিনি লিখিয়াছেন, "আঃ আমি কি ডোম; যে ধর্মশাস্ত্র শিখে ধর্মপণ্ডিত হ'ব?"

ব্রাহ্মণগণ যেমন উপবীত ধারণ করেন, তেমনই পূর্বেই ডোম-পুরোহিত-গণও তাম্র ধারণ করিতেন। তাম্র ধারণ অর্থে বাহুতে তামার তাগা ও হাতে তামার আংটি ধারণ করা। আনুষ্ঠানিক ভাবে তাম্র ধারণ না করিলে পূর্বে কেহ ধর্মঠাকুরের পুরোহিত হইতে পারিত না। এখনও যে সকল ডোম পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্ততঃ অঙ্গুলিতে একটি তামার আংটি ধারণ করিয়া থাকেন—কিন্তু এই বিষয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা

বর্তমানে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের তাম্রদীক্ষার কোনও প্রয়োজন হয় না।

ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণতঃ তিন প্রকার প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ক্রমে এই তিনটি প্রণালীর যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

প্রধানতঃ নিত্যপূজা। যাহাদের গৃহে পরিবারিক ধর্মশীলা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদের গৃহে নিত্যপূজা ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠান সাধারণতঃ হইতে দেখা যায় না। পারিবারিক নিত্যপূজায় কোন ঘটা হয় না, তবে পূজা সম্পর্কিত বিশেষ যদি কোন দৈব কিম্বা জনশ্রুতি মূলক নির্দেশ থাকে তবে তাহা সতর্কতার সঙ্গে পালন করা হয়। যেমন পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, বর্ধমান জিলার খুদকুড়ি গ্রামের আগুরি বাড়ীতে যে একটি ধর্মশীলা প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহাকে প্রত্যহ একসের সিদ্ধ চাউলের নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হয়। তবে এই নিত্য পূজা উপলক্ষেই কোন কোন সময়ে পারিবারিক ধর্মশিলার নিকটও বিশেষ পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন গৃহ কর্তা কোন মোকর্দমায় জয়লাভ করিলেন, তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ধর্মঠাকুরকে একদিন পরমান্ন বা পায়স ভোগ দিলেন এই মাত্র। গৃহে কোন উৎসব অনুষ্ঠানের দিনও তাহার নিত্যপূজার বরাদ্দেয় অতিরিক্ত ও অন্য কোন উপকরণ দ্বারা তাহার ভোগ দেওয়া হইবে ইত্যাদি। নিত্য পূজায় পারিবারিক ধর্মশিলার নিকট সাধারণতঃ কোন পশু বলি দেওয়া হয় না। তবে পরিবারস্থ কাহারও এই বিষয়ে মানসিক থাকিলে তাহা অবশ্য পালন করা হইয়া থাকে। পারিবারিক নিত্যপূজা সাধারণতঃ দিনে দুইবার হয়—প্রথমতঃ দ্বিপ্রহরে ধর্মশীলাটিকে শয্যা হইতে তুলিয়া স্নানাদির পর পূজা করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ রাত্রিকালে ইহাকে বৈকালী নৈবেদ্য দিয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করিয়া রাখা হয়। এই বিষয়ে শালগ্রাম শিলা পূজার সঙ্গে ইহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজা আরও একভাবে হইয়া থাকে। যে গ্রামে বারোয়ারী ধর্মতলা বা ধর্মমন্দির আছে এবং তাহাতে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে সেখানে ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজায় ইহা হইতে একটু বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ঠাকুরের যথা নির্দিষ্ট পূজা ও ভোগের উপর প্রায় অতিরিক্ত মানসিক পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। যেমন অনেকে পুত্রকন্যা কিংবা নিজের অসুখে-বিসুখে বিশেষ

এক গ্রামের ধর্মঠাকুরের নাম করিয়া মানসিক করিয়া থাকে যে রোগমুক্তির পর যেদিন সম্ভব হইবে সে দিন ধর্মঠাকুরের নিকট বিশেষ কিছু ভোগ কিংবা বলি দিয়া তাঁহার পূজা দিবে। বিশেষ কোন ধর্মঠাকুরের খ্যাতি যদি দূরবর্তী গ্রামসমূহেও ছড়াইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহার দেয়াশী প্রদত্ত ঔষধ ও মাদুলী যদি কার্যকরী হয় বলিয়া বিবেচিত হয় তবে গ্রামান্তর হইতেও এই প্রকার মানসিক পূজা আসিয়া থাকে। কোন গ্রামে যদি ধর্মতলা কিংবা ধর্মমন্দির থাকে এবং তাহাতে নিত্যপূজার ব্যবস্থাও থাকে তবে সেই গ্রামের অধিবাসী সাধারণতঃ গ্রামান্তরে গিয়া পূজা দেয় না। কিন্তু ইহার সুনির্দিষ্ট যে কিছু নিয়মও আছে তাহা নহে। এই সকল মানসিক উপলক্ষ্যে সাধারণতঃ পাঁঠা, হাঁস কিংবা কবতুর বলি দেওয়া হয়। বর্তমানে সাধারণতঃ এই সকল মন্দিরে একজন নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও নিম্নশ্রেণীর অন্য একজন তাহার সহায়ক থাকে, মন্দিরের আয়ের ভাগ সেও পায়। মনে হয় এই নিম্নশ্রেণীর সহায়কই পূর্বে দেবতার পূজারী ছিল, ক্রমে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের প্রভাববশতঃ সেই অধিকার ক্রমে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু ডোমজাতীয় সহায়ক, বড় দেখিতে পাওয়া যায় না, মনে হয়, তাহারা ব্রাহ্মণের নীচস্থ হইয়া ধর্মঠাকুরের পূজায় সহায়তা মাত্র করা অপেক্ষা মন্দিরের সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের ডোমদিগের চরিত্র যাঁহারা ভাল জানেন তাঁহারা এ কথার সমর্থন করিবেন। কিন্তু কোন কোন গ্রামে বিশেষতঃ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে কোন কোন গ্রামে ডোম মন্দিরের পূর্ণ কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করে নাই। যে সকল গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে নাই, সেই সকল গ্রামে ডোমই এখনও বারোয়ারী ধর্ম মন্দিরে নিত্যপূজা করিয়া থাকে। অধিকাংশ বারোয়ারী ধর্মমন্দিরের নিত্য ও বার্ষিক পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য হিন্দু জমিদারগণ প্রদত্ত দেবোত্তর জমি আছে। মন্দিরের পূজারীই সেই সকল জমি তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, যে সকল হিন্দু জমিদার এই উপলক্ষে দেবোত্তর জমি দিয়া থাকেন, তাঁহারা বিশেষতঃ তাঁহাদের হিন্দু কর্মচারীগণ এই সকল মন্দির পরিচালনা সম্পর্কেও অনেক সময় কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় এক বারোয়ারী ধর্মমন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায় যে,

বার্ষিক পূজার সময় গ্রামের অধিবাসীদের পরিবর্তে কেবলমাত্র জমিদারের নামেই 'সঙ্কল্প' করা হয়, অর্থাৎ পূজা কেবলমাত্র জমিদারের ব্যয় ও চেষ্টায় একক তাঁহারই মঙ্গল কামনায় অনুষ্ঠিত হইতেছে ইহাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সকল উচ্চ শ্রেণীর জমিদার কিংবা তাহাদের অনুরূপ সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারিগণ ডোম জাতীয় লোক দ্বারা মন্দিরে পূজা করাইতে স্বভাবতঃই পছন্দ করিতেন না। এইজন্য বহু স্থানেই বর্তমানকালে ডোমজাতীয় লোক মন্দিরের সম্পর্ক ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। কোন কোন স্থলে তাহারা বারোয়ারী মন্দিরের নিত্যপূজা করিবার অধিকার রক্ষা করিলেও এই সকল মন্দিরে যখন বাৎসরিক পূজার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তখন প্রায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়। গ্রামের অবস্থা স্বচ্ছল না হইলে নিত্যপূজা সাধারণতঃ হয় না—ধর্মতলা সারা বৎসর পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, গ্রাম্য পাঠশালা, জমিদারের খাজনা আদায়ের কাছারী, কিংবা ভবঘুরের আড্ডা-রূপেই তখন ইহা ব্যবহৃত হয়। দেবতার কোন প্রস্তর-প্রতীক থাকিলেও তাহা অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। কেবলমাত্র বার্ষিক পূজার কয়েকদিন পূর্ব হইতে ইহার উপর গ্রাম্য লোকের সজাগ দৃষ্টি পড়ে। যে সকল ধর্মঠাকুরের স্বচ্ছল দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, সুপ্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে ও পূজার জন্য নির্দিষ্ট পুরোহিত আছে কেবল মাত্র তাহাদিগের ব্যতীত বারোয়ারীতলায় অন্য কোন ঠাকুরের সাধারণতঃ নিত্যপূজা হয় না।

তারপরই বার্ষিক পূজা। পারিবারিক ধর্মশীলার বার্ষিক কোন বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয় না। তবে পরিবারের কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কিংবা কাহারও মানসিক পালন করিতে হইলে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হইতে পারে—তাহাকে বার্ষিক পূজা বলা যায় না। কেবলমাত্র বারোয়ারী ধর্মঠাকুরেরই আড়ম্বরপূর্ণ বার্ষিক পূজা হইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি যে ধর্মঠাকুর সারা বৎসর অনাদৃত থাকিয়া বারোয়ারী মন্দিরে পড়িয়া থাকেন, বার্ষিক পূজার প্রাক্কালে তাহারও মন্দিরের চারিদিক উৎসবের আয়োজন মুখর হইয়া উঠে। যে সকল মন্দিরে নিত্যপূজা হয় সে সকল মন্দিরের ত আর কথাই নাই।

বারোয়ারী ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা চৈত্র পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা—যে কোনদিন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই সম্পর্কে প্রত্যেক

মন্দিরেরই একটি প্রথা, আছে, সেই অনুযায়ীই এই তারিখ পূর্ব হইতেই স্থির হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে কাহারও কাহারও একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পূজা কেবলমাত্র বৈশাখী পূর্ণিমাতেই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। তবে এ'কথা সত্য যে বৈশাখী পূর্ণিমাতেই বার্ষিক পূজা অধিক হয়—ইহার কারণ ঐদিন বুদ্ধদেবের জন্মতিথি বলিয়া নহে, বরং নূতন বৎসরের ইহাই প্রথম পূর্ণিমা তিথি বলিয়া। একটি কথা আমি অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছি, চৈত্র মাসের শেষ ভাগে আমাদের দেশে বর্তমান শিবের গাজন নামে যে একটি লৌকিক অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে পূর্বে ইহার সঙ্গে শিবের কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণ ঐ সময়, কিংবা চৈত্রমাসের শেষদিন অর্থাৎ যেদিন শিবের গাজন অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ হয় সেদিন শিবপূজার কোন তিথি নাই, বরং ঐ সময় সূর্য দ্বাদশ রাশির যাত্রা শেষ করিয়া নূতন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয় বলিয়া তাহা সূর্য পূজারই তিথি হইতে পারে—আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, ধর্মঠাকুর সূর্য দেবতা ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব মনে হয় সমাজে শৈবধর্মের প্রভাবের ফলে চৈত্র মাসের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত সূর্য বা ধর্মঠাকুরের গাজনই বর্তমানে শিবের গাজন বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সংক্রান্তির পরবর্তী প্রধান তিথিই পূর্ণিমা। সেইজন্য ধর্মঠাকুরের গাজনটি চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হইতে না পারিয়া তাহার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য তিথিতে অনুষ্ঠিত হইতে বাধ্য হইতেছে। ক্রমে তাহাই প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন কোন গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় উৎসবের অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হওয়ায় তাহা জ্যৈষ্ঠ কিংবা তৎপরবর্তী পূর্ণিমা তিথি আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আষাঢ়ী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক ধর্মপূজার সংখ্যা নগণ্য। বাঁকুড়া জিলার প্রসিদ্ধ ধর্মমন্দির বেলিয়াতোড় গ্রামে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মের বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয়—আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মের পূজানুষ্ঠানের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বার্ষিক পূজায় শিবের গাজনের মত সর্বত্রই ধর্মের গাজন হয়। শিবের গাজনের সঙ্গে ধর্মের গাজনের আচারের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সেইজন্য মনে হয়, ইহারা মূলতঃ অভিন্ন ছিল; যে অঞ্চলে হিন্দুধর্মের অধিকতর প্রভাব স্থাপিত হইয়াছে, সেই অঞ্চলে ইহা শিবের গাজন নামে পরিচিত হইয়া চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হইতেছে—যে অঞ্চলে হিন্দুধর্মের

প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম সেই অঞ্চলে ইহা ধর্মের গাজন নামে পরিচিত হইয়া ইহার মৌলিক বৈশিষ্ট্য কতকটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। তবে এই অঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক বলিয়া চৈত্রমাসের সর্বত্রই শিবের নামে গাজন হইয়া থাকে—ধর্মের নামে গাজন তৎপরবর্তী মাসের পূর্ণিমা তিথিতে চলিয়া গিয়াছে। বর্ধমান জিলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত দামড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পুজার বিস্তৃত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দুধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে এখন চড়ক অনুষ্ঠানটি ধর্মপূজার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত তথাকথিত শিবের গাজন উপলক্ষেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। তবে এখনও মানভূম জিলার কোন কোন অঞ্চলে যেখানে হিন্দুপ্রভাব তত সক্রিয় হইতে পারে নাই, সেখানেই ধর্মপূজা উপলক্ষে চড়কের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

পূর্বে বার্ষিক ধর্মপূজার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই যে সম্পূর্ণ অভিন্ন তাহা বলিতে পারা যায় না—প্রত্যেক গ্রামেই এই বিষয়ে যে প্রথা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে সাধারণতঃ তাহাই পালন করা হয়—কিন্তু কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—এই মৌলিক বিষয়গুলির মধ্যে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য—একটি ধর্মঠাকুরের আনুষ্ঠানিক স্নান ও দ্বিতীয়টি তাহার পুত্রসন্তান দান করিবার গুণ। এই দুইটি বিষয় প্রত্যেক ধর্মঠাকুরের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে দেবতার প্রতীককে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করাইবার মধ্যে কৃষিজীবি সমাজের sympathetic magic দ্বারা বৃষ্টিপাত করাইবার প্রয়াসেরই পরিচয় পাওয়া যায়—এই বৃষ্টিপাতের উদেশ্য যে দেবতাকে সাধারণতঃ sympathetic magic দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করান হয়—তিনি সূর্যদেবতা। আষাঢ়ের প্রারম্ভে পুরীতে যে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহারও ইহাই তাৎপর্য। বন্ধ্যা নারীকে সন্তান দান করিবার ক্ষমতাও সূর্যদেবতারই একটি বিশিষ্ট গুণ—কারণ পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই সূর্যকে উর্ব্বরতা শক্তির প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে—এখনও মধ্য প্রদেশের উপজাতীয় সমাজের নারীগণ সন্তান বাসনায় নানাভাবে সূর্যেরই উপাসনা করিয়া থাকে।

বীরভূম জিলার অনেক গ্রামেই বার্ষিক পূজা উপলক্ষে 'ধুপ বানামো' বা 'বানামো' নামে একটি অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহার অর্থ—ধর্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি কুণ্ড করা হয়—এবং তাহাতে কাষ্ঠ দ্বারা আগুন জ্বালান হয়। এই অগ্নিকুণ্ডের প্রায় সংলগ্ন ৩।৪ হাত ফাঁক দুইটি শক্ত খুঁটি পোঁতা থাকে, খুঁটিগুলি ৮।৯ ফুট উচ্চ—অনেক সময় ইঁট সুরকী দিয়া ঐ দুইটিকে স্তম্ভের মত করিয়া বাঁধাইয়াও দেওয়া হয়। খুঁটি দুইটির উপর এক খণ্ড শক্ত কাঠ বাঁধা থাকে, এই কাঠের মধ্যে দুইটি দড়ির কড়া (ring-এর মত) ঝোলানো থাকে, ভক্ত্যাদিগকে লইয়া একে একে ঐ দড়ির কড়ার ভিতর দিয়া পা পরাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদের মুখ নীচের দিকে ঝুলিতে থাকে। তাহাদের হাতে ফুল বিল্বপত্র পুষ্পাদি দেওয়া হয় এবং প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের অপর পার্শ্বে একটি বেদীতে ধর্মরাজ ঠাকুরের সিংহাসন আনিয়া স্থাপন করা হয়। খুঁটি দুইটির পার্শ্বে দুইজন ভক্ত্যা দাঁড়াইয়া থাকে এবং তাহারা তাহার কোমর ধরিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর ক্রমাগত দোলাইতে থাকে—ঐ অবস্থায় সে হস্তস্থিত ফুল ধর্মরাজের উদেশ্যে ছুঁড়িয়া দিতে থাকে। সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বাদ্যভাণ্ড বাজিতে থাকে এবং ভক্ত্যাগণও উচ্চৈস্বরে ধর্মরাজের গুণগান গাহিতে থাকে। এইভাবে প্রত্যেক ভক্ত্যাকেই 'বানামো' করিতে হয়। বীরভূম জিলার কোন কোন গ্রামের ধর্মতলায় এই প্রকার 'বানামো' করিবার ইষ্টক নির্মিত স্থায়ী খুঁটি দেখিতে পাওয়া যায়।

বীরভূম জিলার কোন কোন গ্রামে এই উপলক্ষে ভক্ত্যাগণ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া হাঁটিয়া থাকে। এই রীতি অন্যান্য জিলার অনেক গ্রামেই প্রচলিত আছে। ভক্ত্যাগণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত করে এবং ধর্মরাজের নাম লইয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে ডাকিতে অগ্নির উপর দিয়া নৃত্য করিয়া অগ্রসর হয়, হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার লইযা ছোঁড়াছুড়িও করিয়া থাকে, বীরভূম জেলায় 'ভাঁড়াল খেলা' নামক একটি বিষয়ও প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহা এই প্রকার—ভক্ত্যাগণ মাথায় করিয়া এক একটা মাটির হাঁড়ি লয়। হাঁড়িটা ফুল দিয়া সাজান হয়। প্রত্যেক গ্রামের বাহিরে একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীর তীরে শুঁড়িরা দেশী মদ মিশ্রিত জলে উক্ত মাটির ভাঁড় পূর্ণ করিয়া দেয়। বীরভূম জিলার প্রায় সর্বত্রই ধর্মপূজা উপলক্ষে পঁচাই বা দেশীমদের

ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। পূজা উপলক্ষে পঁচাইর ভাঁড় আনয়ন একটি বিশিষ্ট আচার। ভাঁড়াল মাথায় লইলে দেবতার 'ভর' হয়—ভক্ত্যা মাথা দুলাইতে থাকে, দেবতা তাহার উপর আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে। ভক্ত্যাগণ ভাঁড় মাথায় লইয়া মন্দিরের দিকে আসিতে থাকে, সেই সময় রোগের ঔষধ প্রত্যাশায় রোগীর আত্মীয় স্বজন, কোন কোন সময় রোগী নিজেও, এবং বন্ধ্যা নারীগণ তাহাদের সম্মুখে মাটিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে এবং যে যাহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করে—কোন একটা জবাব না পাওয়া পর্যন্ত পথ ছাড়িয়া দেয় না। ভক্ত্যাগণ প্রত্যেককেই এক একটা উপায় বলিয়া দেয়, তারপর নিজেরা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হয়। মন্দিরের সম্মুখে আসিয়াও ভাঁড়াল মাথায় লইয়া কিছুক্ষণ নৃত্য চলিতে থাকে, ভক্ত্যাগণ নৃত্য করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণও করিয়া থাকে। অতঃপর ভাঁড়ালগুলি মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া রাখা হয়, ভাঁড়গুলি কোন গাছের নীচে ঢালিয়া দেয়। ইহাকেই 'ভাঁড়ার খেলা' বলে। বীরভূম ব্যতীত এই 'ভাঁড়ার খেলা' অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না—অতএব ইহা বীরভূমের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়াই মনে হয়।

তৃতীয় প্রকারের ধর্ম পূজার নাম 'ঘর-ভরা'। ইহাকে শুদ্ধ করিয়া 'গৃহভরণ'ও বলা হইয়া থাকে। রোগমুক্তি কিংবা অন্যান্য কারণে ব্যক্তিবিশেষের নামে মানসিক করিয়া ধর্ম পূজার যে আড়ম্বর পূর্ণ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে তাহারই নাম 'ঘর-ভরা'। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, এবং ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া বহুলোকের সহায়তায় ইহা অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র নিতান্ত স্বচ্ছল ব্যক্তি ব্যতীত কেহই এই পূজা মানসিক করিতে পারে না—সেইজন্য ইহা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তবে ইহা বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলায় এখনও অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়—বীরভূম ও বর্ধমানে ইহার প্রচলন এখন আর নাই বলিলেই চলে। এই উৎসব ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই কয়মাসের যে কোন মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় সমাপ্ত হয়। বারদিন ব্যাপিয়া এই অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে বারটি ধর্মশিলার প্রয়োজন হয়—পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে বারটি ধর্মশিলা সংগ্রহ করিয়া এক একটি করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাস্থানে

আনয়ন করা হয়। তারপর তাহাদের সকলের এক সঙ্গে পূজা হয়। কোন কোন প্রাচীন মন্দিরে বারটি কিংবা তাহার কিছু কম সংখ্যক ধর্মশিলা স্থায়ীভাবেও রাখা হয়। তাহাদের অন্যত্র হইতে ধর্মশিলা ধার করিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় না। 'ঘর-ভরা' অনুষ্ঠানে বারজন ভক্ত্যা ও চারিজন আমিনী (স্ত্রী বা বালা ভক্ত্যা)-র প্রয়োজন হয়—এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকটি বারটি করিয়া এই সকল উপকরণেরও প্রয়োজন হয়, যেমন, বার জাতির ফুল, বলির জন্য বারটি পাঁঠা, বারটি 'পাঠ', বারগাছি দুর্বা, বারটি সুপারি, বারটি উত্তরীয় ইত্যাদি। ধর্মপূজার সঙ্গে দ্বাদশ সংখ্যাটি যুক্ত হইবার তাৎপর্য পরে ব্যাখ্যা করিয়াছি। বর্তমানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে যে 'ঘরভরা' উৎসব হয় তাহাতে বারজন ভক্ত্যা সকল সময় পাওয়া সম্ভব হয় না, সেইজন্য ইহা অপেক্ষা কম ভক্ত্যা লইয়াই অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে—অর্থনৈতিক কারণের জন্য বলির বারটি পাঁঠা সংগ্রহ করিবার রীতিও পরিত্যক্ত হইয়াছে—এখন দুইটি পাঁঠাতেই এই কার্য সম্পন্ন হয়—সে কথা পরে বলিতেছি।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দিরের সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অস্থায়ী মণ্ডপ নির্মাণ করা হয় এবং তাহাতেই সকল অনুষ্ঠান পালন করা হয়, স্থায়ী মন্দিরের মধ্যে কিছুই করা হয় না।

তৃতীয়া তিথি হইতেই ঘরভরা উৎসবের আচারসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ দিন ডোমজাতীয় পুরোহিত একটি মাটির ঘট মাথায় লইয়া একটি নির্দিষ্ট 'আকাট' পুকুর হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে জল ভরিয়া আনিতে যায়। যে পুকুর কাটা হয় নাই, আপনা হইতেই হইয়াছে অর্থাৎ natural reservoir-কেই 'আকাটা' পুকুর বলে, এই পুকুরের জলই পূজার সকল আচারের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূজার পূর্বদিন হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ কার্যের জন্য কেহ এই পুকুরের জল ব্যবহার করিতে পারে না। ঘট জলপূর্ণ করিয়া মণ্ডপের মধ্যে লইয়া আনা হয় এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত হিন্দু আচারে ইহাকে মন্দিরের মণ্ডপের মধ্যে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। তারপর বারটি ধর্মশিলাকেই পূজা করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিয়া মণ্ডপে স্থাপন করা হয়। বারটি ধর্মশিলার মধ্যে একটি ধর্মশিলাকে প্রধান বলিয়া

মনে করা হয় এবং তাহার সম্মুখেই ঘট স্থাপন করা হয়। সেইদিন হইতে ঘটভরা হইতে আরম্ভ করিয়া উৎসব শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি অনুষ্ঠান পালন করিবার সময় বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি সুবৃহৎ ঢাক থাকে—ইহাদের বাদ্যে চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলিও কয়দিন ব্যপিয়া উচ্চকিত হইতে থাকে। দ্বিপ্রাহারিক পূজা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত চণ্ডীপাঠ করেন ও ডোম পুরোহিত সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক কতকগুলি বাংলা ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে। তারপর ডোম পুরোহিত 'জল পাবন', 'টীকা পাবন', 'পুষ্প পাবন', ইত্যাদি বিষয়কও কতকগুলি ছড়া বলিয়া থাকেন। এই ছড়াগুলি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

ঘরভরা উৎসবেও তৃতীয়া তিথি হইতেই ভক্ত্যাগণের আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করিবার কথা। কিন্তু যে কারণে বাৎসরিক গাজন উপলক্ষে তৃতীয়া তিথি হইতে আজকাল আর আনুষ্ঠানিকভাবে ভক্ত্যাগণ যোগদান করে না সেই জন্যই ইহাতেও ভক্ত্যাগণ পূর্ণিমার পাঁচ সাত কিংবা নয়দিন পূর্বে আসিয়া যোগদান করে। বাৎসরিক ধর্মপূজার মতই ভক্ত্যাগণ ইহাতেও জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পৈতা ধারণ করিয়া পূজার সকল কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সমানাধিকার লাভ করে। কোন কোন অঞ্চলে বালা ভক্ত্যা (স্ত্রীভক্ত্যা) গণও 'পৈতা' ধারণ করে, তাহাদের সঙ্গেও পুরুষ ভক্ত্যাদিগের কোন পার্থক্য থাকে না, স্ত্রী বলিয়া পূজার কোন আচারেও অংশ গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হয় না।

তৃতীয় দিনেই সর্বপ্রথম সন্ধ্যার পর এক পালা ধর্মঠাকুরের মহাত্ম্যসূচক ধর্মমঙ্গল গান হয়। ধর্মমঙ্গল গান বার দিনের চব্বিশ পালায় বিভক্ত। প্রত্যহ দুই পালা গীত হইয়া ইহা বার দিনে সমাপ্ত হইবার কথা। তবে প্রথম দিনে সন্ধ্যার পর ইহার এক পালা ও পূর্ণিমার পরের দিন সর্বশেষ পালা গীত হইয়া ইহার উপসংহার হয়। এই ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয় বস্তু সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখানে ধর্মমঙ্গল গান গাহিবার প্রণালী সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ করা যাইতেছে।

মন্দিরে প্রাঙ্গণের উন্মুক্তস্থানে, কখনও বা উপরে চাঁদোয়া টানাইয়া তাহার নীচে ধর্মমঙ্গল গানের আসর বসিয়া থাকে। ইহাতে একজন মূল গায়েন

থাকে, সে পায়ে নূপুর ও চামর লইয়া নাচিয়া নাচিয়া অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে ইহার আখ্যান-মূলক (narrative) পদগুলি গাহিয়া যাইতে থাকে। তৎসঙ্গে সামান্য কিছু বাদ্যের ব্যবস্থা থাকে এবং দুই চারিজন দোহারও থাকে—তাহারা কোন কোন পদের ধুয়া ধরে। এইভাবে প্রতিদিন বৈকালে এক পালা ও রাত্রে এক পালা গীত হয়। কোন কোন অঞ্চলে প্রথমদিন রাত্রে মাত্র একপালা এবং সর্বশেষদিন দিনে মাত্র এক পালা গীত হয়। সর্বশেষ রাত্রির পালাটি দীর্ঘতম, বিষয়ের দিক দিয়াও গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য ইহা গাহিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়। সেইদিন পূর্ণিমা তিথি থাকে এবং উৎসবের শেষদিন বলিয়া শ্রোতাগণও উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গান শুনিয়া থাকে, এইজন্য এই পালাটির নাম জাগরণ পালা।

সেইদিনই সন্ধ্যাকালে ধর্মঠাকুরকে পায়েস রন্ধন করিয়া ভোগ দেওয়া হয়—তাহাকে 'মনুই ভোগ' বলে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত মন্ত্রদ্বারা দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিবার পর ডোম পুরোহিত বা ডোম পণ্ডিত (ধর্মঠাকুরের ডোম পুরোহিতকে পণ্ডিত বলা হয়) একটি বাংলা ছড়া বলিয়া সেই ভোগ দেবতাকে নিবেদন করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মণের প্রভাব এই অঞ্চলে বিস্তৃত হইবার পূর্বে ডোম পণ্ডিতগণই এই সকল বাংলা ছড়া বলিয়া ইহার পৌরোহিত্যের সকল দায়িত্ব পালন করিত।

'মনুই ভোগে'র পর স্বতন্ত্র আর একটি ছড়া বলিয়া ডোম পুরোহিত ধর্মঠাকুরকে ছোলাভাজা নিবেদন করিয়া দেয়। ভোগ নিবেদন করা হইলে পর ভক্ত্যাগণ মনুই রন্ধনের হাঁড়িটিকে সেই রাত্রেই বাদ্যভাণ্ড সহকারে জলে ভাসাইয়া দিয়া আসে।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ চতুর্থী তিথিতে ভোর বেলাতেই ডোম পুরোহিত ধর্মঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ বিষয়ক ছড়া আবৃত্তি করে, দ্বিপ্রহরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দশোপচারে বা পাঞ্চাপচারে ধর্মঠাকুরের পূজা করেন। পূর্বদিনের মতই অন্যান্য আচার পালন করা হয়। তবে এইদিন হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ধর্মমঙ্গলগান প্রত্যহ বৈকালে একপালা ও রাত্রে একপালা করিয়া গীত হয়। এইরূপভাবে কয়েকদিন চলিবার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কামিন্যা আনয়ন করিতে হয়। কামিন্যা ধর্মঠাকুরের পত্নী, তাহাকে ভিন্ন ধর্মঠাকুরের পূজা

সম্পূর্ণ হয় না। তবে তাহার কোন মূর্ত্তি নাই, সাধারণ মৃন্ময় পূজা-ঘটেই তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, পঞ্চমী হইতে একাদশীর মধ্যে যে কোনদিনে কামিন্যা আনয়ন করা যাইতে পারে। যেদিন কামিন্যা আনয়ন করিতে হইবে সেইদিন সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা হইবার পর রাত্রের গান আরম্ভ হইলে, পূজার উপচার সহ ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাগণকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহ পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট একটি পুষ্করিণীর তীরে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে ছোট একটি মাটির ঘটে ব্রাহ্মণ কিংবা ডোম পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া তারপর কামিন্যা-ঘটে কমিন্যার আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা অধিবাস, কামিন্যা ও কামিন্যার associate goddesses দের পূজা করিয়া সেখানেই একটি ছাগ কিংবা মাগুরমাছ বলি দিয়া থাকে। তারপর পাটভক্ত্যা (প্রধান ভক্ত্যা) মস্তকে কামিন্যা-ঘট দিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে তাহা লইয়া মণ্ডপে আসিয়া পৌঁছায়। সেই কামিন্যা ঘট প্রধান ধর্মশিলাটির বামভাগে স্থাপন করিয়া পুনর্বার ষোড়শোপচারে পূজা আরক প্রভৃতি করিতে হয়।

কামিন্যা আনিবার পরদিনই মণ্ডপের পার্শ্বে হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয় (swinging poles) পুঁতিয়া রাখিতে হয়। সেইদিন হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে ইহাতে ভক্ত্যাগণ নীচে ধুনা জ্বালাইয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া দোল খায়। দোল খাইবার পূর্বে হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয়কে ডোম পুরোহিত আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজা করিয়া থাকে। ডোম পুরোহিত এই উপলক্ষেও কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে। সেইদিন হইতে প্রত্যহ ভক্ত্যাগণ দ্বাদশ প্রকারে ধর্মঠাকুরের সেবা করিয়া থাকে, যেমন, প্রণাম সেবা অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ প্রণাম, বেতচালা অর্থাৎ স্বহস্তে স্বগাত্রে বেত্রাঘাত ইত্যাদি। ইহাকে দ্বাদশ সেবা বলে, তারপর ভক্ত্যাগণ সকলে একটি সারি দিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহাদের উপর দিয়া কাঁধের উপর পা রাখিয়া একজন ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবে—এইরূপ সেবা করিলে দ্বাদশ সেবার কোন অঙ্গহীনতা থাকিলে তাহা পূর্ণ হয়।

ইহার পর প্রধান অনুষ্ঠানের নাম মুক্তা আনয়ন, মুক্তা কথাটির মুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক আছে মনে করিয়া কেহ কেহ ইহাকে এখন মুক্তি আনয়নও বলিয়া থাকেন। মুক্তা বলিতে মুক্তাহার ধান্যের আতপ চাউল বুঝায়, এই চাউলের উপরে মুক্তাদেবী বা মুক্তিদেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, আবাহন, অধিবাস, পূজা,

ধর্মপূজা ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়া সেই চাউল একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া তাহা বাদ্যভাণ্ড সহকারে পূজার মণ্ডপে লইয়া আসা হয়। কেহ কেহ এই মুক্তা বা মুক্তিদেবীকে ধর্মঠাকুরের পত্নী বলিয়া মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি কৃষিব্রতের আচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেখান হইতে প্রতি বৎসর মুক্তা আনয়ন করিতে হইবে তাহা একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং সেইস্থানে পূর্ব হইতেই ইহার জন্য আয়োজন হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্বদিন বরের গৃহ হইতে যে রকম তৈল হরিদ্রা ও অধিবাস প্রভৃতি পাঠাইবার রীতি আছে মুক্তা আনয়নের পূর্বদিনও ধর্মপূজার মণ্ডপ হইতে সেইপ্রকার তৈলহরিদ্রা ও অধিবাস পাঠান হইয়া থাকে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, মুক্তাদেবী বা মুক্তামালা ধান্যকে ধর্মঠাকুরের পত্নীরূপে কল্পনা করা হয় এবং এই পূজা উপলক্ষে তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যেদিন মুক্তা আনয়ন করিতে হইবে সেইদিন সন্ধ্যার পর রাত্রের পালা ধর্মমঙ্গল গান আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাদিগকে সঙ্গে করিয়া একটি সুসজ্জিত চতুর্দোলায় ধর্মঠাকুরের পাদুকা প্রতীককে স্থাপন করিয়া বিবাহের সকল রকম উপকরণ যথা মুকুট ইত্যাদি লইয়া বাদ্যভাণ্ড-সহকারে নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 'বরযাত্রী' রূপে তাহার অনুগমন করে। সেখানে উপস্থিত হইলে তত্রত্য ব্যক্তিগণ, তাহাদিগের উপযুক্ত অভ্যর্থনা দ্বারা সকলের মান্য রক্ষা করে এবং সকলেই উপযুক্তভাবে জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। পরে তাহাদের ব্রাহ্মণ কিংবা ডোম পুরোহিত মুক্তাহার ধান্যের উত্তম আতপ চাউল পাঁচ সের একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া ধর্মঠাকুরের দোলার নিকট আনিয়া স্থাপন করে। এই ব্রাহ্মণ পুরোহিত চাউলকে মুক্তাদেবী বলিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ডোম পুরোহিত 'মুক্তা মঙ্গলা' ও ধান্যের জন্ম বিবরণ নামক ছড়া পাঠ করে। পরে ধর্ম ও মুক্তাকে চতুর্দোলায় স্থাপন করিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে পূজা মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়। মণ্ডপে আনিয়া 'মুক্তদেবী'সহ ধর্মের দোলা যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। এই সব কার্যে প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়। ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মমঙ্গল গানও চলিতে থাকে।

ত্রয়োদশী তিথিতে দিনের সকল কৃত্য শেষ করিয়া বৈকালবেলা

আনুষ্ঠানিকভাবে (ceremonially) গম্ভীরা বৃক্ষ ছেদন করিতে যাইতে হয়। ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে নিকটস্থ কোন গাম্ভারী বা গামার বৃক্ষের নীচে উপস্থিত হয়। বৃক্ষতলে ঘট স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ পঞ্চদেবতা, ধর্মঠাকুর, তাহার কামিন্যা ও গাম্ভারীবৃক্ষের অধিবাস, পূজা ইত্যাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া থাকে। তারপর ডোম পুরোহিত 'গাম্ভারী মঙ্গলা' নামক এক বাংলা ছড়া আবৃত্তি করে। তারপর প্রধান ভক্ত্যা আবার কতকগুলি বাংলা ছড়া বলিয়া কুঠার দিয়া গাম্ভারী বৃক্ষের একটা বড় ডাল ছেদন করে। সেই ডাল লইয়া সকলে কর্মকারের (blacksmith) গৃহে যায়, কর্মকার সেই ডাল দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাটা প্রস্তুত করে, প্রত্যেকটা পাটার উপর ৫।৭টা লোহার কাঁটা সংযুক্ত করিয়া দেয়। পূর্ণিমার দিন ইহার উপর ভক্ত্যাগণ ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেইজন্য ইহার নাম ঝাঁপকাঁটা।

চতুর্দশী তিথিতেও দিনের বেলা নিয়মিত ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। পূজা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহযোগে সেই গ্রামের কিংবা তৎসংলগ্ন অন্য কোন গ্রামেরও নির্দিষ্ট গৃহস্থের বাড়ীতে যায়—যেখানে সকলে যে গৃহস্থের বাড়ীতে যায়—সেখানে গিয়া সকল গৃহস্থের জয়ধ্বনি করিয়া থাকে এবং ভক্ত্যাগণ তাহার জয়গান করে। এই সকল গৃহস্থ ধর্মপূজার জন্য কিছু কিছু করিয়া নগদ অর্থ দান করেন। যে সকল গৃহস্থের বাড়ীতে এই উদেশ্যে যাওয়া হয় তাহাদিগকে 'রাজা' বলে, এবং তাহাদের নিকট এই ভাবে অর্থের জন্য আবেদন করাকে 'রাজা ভেটা' বলে। গৃহস্থজন ইহাতে তাহাদের ইচ্ছামতই অর্থ দিয়া থাকেন, ইহাতে কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

ঘরভরা অনুষ্ঠানে যে দুইটি পাঁঠা বলি হয় তাহাদের মধ্যে যেটি প্রধান তাহার নাম লুয়ে। লুয়ে বলি দিয়া ইহার ছিন্নমুণ্ডটি একটি হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া সারারাত সেই হাঁড়িটি কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে বন্ধ্যা নারী পুত্র লাভ করে বলিয়া বিশ্বাস। এই উপলক্ষ্যে কোন না কোন বন্ধ্যা নারী আপনা হইতে আসিয়া লুয়ের হাঁড়ি ধরিবার জন্য প্রার্থী হয়। বর্তমানে কোন কোন সময় এই প্রকার নারী অনুসন্ধান করিয়াও আনিতে হয়। যে ব্যক্তির স্ত্রীর

লুয়ের হাঁড়ি ধরা স্থির হয়, সেই ব্যক্তি সস্ত্রীক চতুর্দশী তিথি হইতেই হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের লুয়েকে স্নান করাইয়া আনিতে হয়, তারপর একটি হলুদ বর্ণের নূতন কাপড় পঞ্চশস্য প্রভৃতি বাঁধিয়া তাহা লুয়ের গলায় বাঁধিয়া দিতে হয়। গ্রামের স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ সেইদিনে উপবাসী থাকিয়া ধর্মকে দীপদান করে। অনেক মেয়ে এই সময়ে মাথায় ও বক্ষে ধুনার মালসা রাখিয়া ধুনা পোড়ায়।

ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত কর্তৃক ধর্মঠাকুরের সেইদিনের মত নির্দিষ্ট পূজা সম্পন্ন হইলে পর এই উভয়ে পুরোহিত সমভিব্যাহারে ভক্ত্যাগণ ঝাঁপকাঁটা, শান বান, পূজার উপচার লইয়া ধর্মঠাকুর ও তাহার পত্নী মুক্তাকে চতুর্দোলায় চাপাইয়া লুয়ে হত ছাগকে সঙ্গে করিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে নির্দিষ্ট পুকুর বা নদী তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় ডোম পুরোহিত ও মুক্তাতণ্ডুলগুলিকে কতকগুলি বাংলা ছড়া উচ্চারণ করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করায়। তারপর বান, শালবান, জিহ্বাবান, লুয়ে ছাগ, ঝাপকাঁটা ইত্যাদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করাইয়া স্ত্রী ও পুরুষ ভক্ত্যাগণও স্নান করিয়া থাকে। ইহার পর বাদ্যভাণ্ড সহকারে সকলে পুনরায় মণ্ডপে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিয়া ডোম পুরোহিত মুক্তাদেবীকে বসাইবার জন্য এক মণ্ডপ চিত্রিত করে, তথায় ডোম পুরোহিত মুক্তার পূজা করিয়া থাকে। মুক্তিপূজার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান রঙ করিয়া রাখা হয়—সেই স্থানটি ধর্মঠাকুরের মণ্ডপের মধ্যেও হইতে পারে, কিংবা একটি স্বতন্ত্র চালাঘর বাঁধিয়া তাহার মধ্যেও হইতে পারে। ইহাকে মুক্তামণ্ডপ বা মুক্তিমণ্ডপ বলে।

ডোম পুরোহিত মুক্তা তণ্ডুল ও প্রধান ভক্ত্যাকে লইয়া মুক্তিমণ্ডপে যায়, সেখানে নানা দেবতার পূজা করিবার পর ডোম পুরোহিত প্রধান ভক্ত্যার দুইহাতে দুইমুষ্টি মুক্তিতণ্ডুল দিয়া, নূতন গামছা দিয়া তাহার দুইচোখ বাঁধিয়া দেয়, তারপর ডোম পুরোহিত কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করে। ছড়াগুলি আবৃত্তি করা শেষ হইয়া গেলে প্রধান ভক্ত্যা বা পাটভক্ত্যা সেই দুই মুষ্টি চাউল মাটিতে রাখিয়া দিয়া বাহিরে গিয়া চক্ষুর বাঁধন খুলিয়া দেয়। ডোম পণ্ডিত সেই দুই মুষ্টি চাউল লইয়া মুক্তি মণ্ডল অঙ্কিত করে—এই মুক্তি মণ্ডলের মধ্যে ধর্মের পাদপদ্ম, কূর্ম্ম, অনন্ত ও বাসুকি নাগ, হস্তী, দ্বারপাল, দিক্‌পাল, ইত্যাদি

অঙ্কিত হয়। ইহার অভ্যন্তরস্ত কোন কোন চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য রঙিন গুড়ি (powder) ও ব্যবহৃত হয়। যদি কোন নারী পুত্র কামনায় এই মণ্ডল স্পর্শ করিতে চায় তবে ডোম পুরোহিত তাহাকে দিয়া কতকগুলি বাংলা ছড়া বলাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাকে ইহা স্পর্শ করাইয়া দেয়। সেই নারীকে তাহার স্বামীর সঙ্গে নিরাহারে অনিদ্রায় পরদিন মুক্তা বিসর্জন পর্যন্ত সেই মুক্তামণ্ডলে বসিয়া থাকিতে হয়। ডোম পণ্ডিত ভিন্ন অপর কেহ মুক্তামণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারে না। এমন কি ব্রাহ্মণ পুরোহিতও নয়। ডোম পুরোহিত সর্বদা মণ্ডপ বন্ধ করিয়া রাখে।

পুর্ণিমার দিন প্রত্যুষ হইতেই ভক্ত্যাগণ ধর্মের নামে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড তুমুল শব্দে বাজিতে থাকে। পুর্ণিমার দিন সকাল বেলা বাণ বা লৌহশলাকা ও পাট পূজা করা হয়। এই সকল লৌহ শলাকা দ্বারা ভক্ত্যাগণ জিহ্বা ফুঁড়িয়া থাকে—পাটের উপর লৌহ শলাকা পুঁতিয়া তাহার উপর শয়ন করে। সেইদিনই ভক্ত্যাগণ আর একটি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করে, তাহার নাম 'নবখণ্ডসেবা'। ধর্মমঙ্গল গানে যে কাহিনী গীত হয়, তাহার নায়ক লাউসেন হাকন্দ নামক পুকুরের তীরে নয় খণ্ডে দেহ খণ্ডিত করিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়, ভক্ত্যাগণ সেই ক্রিয়ার অভিনয় মাত্র করিয়া থাকে, ইহাকেই 'নবখণ্ডসেবা' বলে। পূজা মণ্ডপের মধ্যেই ধর্মঠাকুরের সম্মুখে একটি চতুষ্কোণ কূপ খনন করিয়া রাখা হয়, ইহাই হাকন্দ পুকুর। ভক্ত্যারা স্নান করিয়া শালবাণ, বাণ, জিহ্বাবাণ, ঝাঁপকাঁটা সূচীমুখ, খড়্গ, অর্ধচন্দ্র, ক্ষুরধার ইত্যাদি লৌহ-নির্মিত অস্ত্র লইয়া মণ্ডপে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ইহাদের যথারীতি পূজা করিয়া দেন। তখন সে সকল ভক্ত্যা 'নবখণ্ডসেবা' করিবে, তাহারা মন্ত্রপাঠ করিয়া দেহের নয়টি স্থানে বাণ বা লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে। যে সকল ভক্ত্যা নয়টি লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিতে না পারে, তাহারা কেবল মাত্র জিহ্বাবাণ দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করিয়া থাকে। ভক্ত্যাগণ তখন লাল রঙের পুষ্পমাল্য গলায় ধারণ করিয়া থাকে। যে সকল ভক্ত্যা দেহের নয় জায়গায় লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা হাকন্দ পুকুরের মধ্যে উপবেশন করে, পুকুরের চারিধারে চারিটি ঘাট থাকে, চারি ঘাটে চারিটি ভক্ত্যা ও ইহার

চারিধারে অন্যান্য ভক্ত্যাগণ শুইয়া থাকে। নবখণ্ডসেবীদিগের দুই ধারে দুইটি ধারাল খড়্গ রাখা হয়, তারপর পুকুরের উপরিভাগ কলার পাতা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়, ভক্ত্যাদিগের কেবল মাথাগুলি উপরের দিকে বাহির হইয়া থাকে। কেহ ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া নবখণ্ডসেবীর মাথার উপর বসাইয়া দেয়, চিত্রটিকে একটি বাস্তব রূপ দিবার জন্য কেহ আলতা গুলিয়া ভক্ত্যাদের গায়ের উপর ছড়াইয়া দেয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন যখন নবখণ্ডে দেহ কাটিয়া ধর্মকে পূজা করিয়াছিলেন, তখন এক বাটুয়া কুকুর সেই দেহ খণ্ডগুলি পাহারা দিয়া রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। এখানেও কেহ কালো কম্বল গায়ে দিয়া বাটুয়া কুকুর সাজিয়া ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া থাকে। এই সময় ধর্মমঙ্গল গানের গায়কদল আসর হইতে নামিয়া এই কৃত্রিম পুকুরের ধারে ভক্ত্যাদিগের নিকটে আসে, সেখানে আসিয়া লাউসেনের নবখণ্ড সেবার কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পুনর্জীবন লাভ ও পশ্চিমদিকে সূর্যোদয়ের বৃত্তান্ত গান করে। গান শেষ হইলে সকল ভক্ত্যাই সেখানে উঠিয়া কয়েকবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ধর্মঠাকুরের আসনের নিকট গিয়া তাহাদের গা হইতে লৌহ শলাকাগুলি খুলিয়া দেয়।

লুয়ে পাঁঠার মুণ্ড রাখিবার জন্য একটি বড় মাটির হাঁড়ি সংগৃহীত হয়। হাঁড়ির একটি ঢাকনাও থাকে। হাঁড়ির গায়ে কিছু দুর্বোধ্য মন্ত্র লিখিয়া দেওয়ার পর হাঁড়িটি হলুদ বর্ণের নূতন বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া ভিতরে রক্তপুষ্প ও পঞ্চফুল দিয়া একটি চাউল পূর্ণ কুলার ওপর বসাইয়া রাখা হয়। একটি হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রে পাঁচটি ফল বাঁধিয়া তাহা হাঁড়ির গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তারপর ব্রাহ্মণ ও ডোম পুরোহিত ভক্ত্যা ও লুইয়া ছাগটি সহ বিবিধ পুজোপ-করণ লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে একটি নির্দিষ্ট পুকুরে বা নদীতে যায়। এখানে সকলে স্নান পূজা সম্পন্ন করে, লুইয়া ছাগটিকেও স্নান করান হয়। তারপর পুজোপকরণ সঙ্গে করিয়া লইয়া সকলে মহাসমারোহে বাদ্যভাণ্ড সহকারে মণ্ডপে ফিরিয়া আসে।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক এইবার ধর্মঠাকুরের নিকট লুইয়া ছাগকে উৎসর্গ করা হয়, ইহার সঙ্গে আর একটি ছাগও উৎসর্গীকৃত হয়—তাহার নাম কোল-লুইয়া। ডোম পুরোহিত ছাগের জন্ম সম্বন্ধে একটি বাংলা ছড়া আবৃত্তি করিয়া

থাকে। কর্মকার জাতীয় বলিকর লুইয়ার মস্তক ছেদন করে—হাড়িকাঠে যথারীতি লুইয়া বলি হয় না, ইহার বলিদানের বিধি একটু বিচিত্র। লুইয়া ফুল বেলপাতা খাইতে থাকে, বলিকর সেই অবস্থায় এক কোপে ইহার মস্তক দেহচ্যুত করে, যদি ইহাতে কোন বিঘ্ন হয়, অর্থাৎ এক কোপে মস্তক দ্বিখণ্ডিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে পূজার কোন অঙ্গহানির জন্য দেবতা বলি গ্রহণ করেন নাই, সেইজন্য পুনরায় বলির ব্যবস্থা করিতে হয়। দ্বিতীয় ছাগ বা কোল লুইয়ারও এই ভাবেই বলি হয়। ডোম পুরোহিত তখন 'দিক ডাক' ও "কাটা মনুই" নামক ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

লুইয়ের মস্তক ছিন্ন হইবা মাত্র তাহা পূর্বোল্লিখিত হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করা হয়। হাঁড়ির মুখ সরা দিয়া ঢাকিয়া, একটু ফাঁক রাখিয়া ময়দার আঠা দিয়া জুড়িয়া দিতে হয়। একটি ঘৃতের প্রদীপ হাঁড়ির উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। তারপর হাঁড়িতে কামিন্যাদেবীর পূজা হয়। কোল লুইয়ের মুণ্ড ও রক্ত যথারীতি ধর্ম ঠাকুরের নামে স্বতন্ত্রভাবে লইয়া নিবেদন করা হয়।

যে বন্ধ্যা নারী পুত্র কামনা করিয়া লুইয়ের হাঁড়ি ধারণ করে, তাহাকে ডোম বা পুরোহিত মন্ত্রাদি বলিয়া দিলে সে হাঁড়িটি কোলে লইয়া বসে—উপবাসী থাকিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া হাঁড়ি ধরিয়া লইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। হাঁড়ির মুখের ফাঁক দিয়া সেই মুণ্ডের উদ্দেশ্যে বারবার দুধ ঢালিয়া দেওয়া হয় —ইতিপূর্ব্বেই মন্ত্রদ্বারা লুইয়ের মুণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করা হইয়া থাকে এবং মুণ্ডটিকে নবজাত শিশুসন্তানের মত গণ্য করা হইয়া থাকে।

তারপর লুয়ের রক্তের সঙ্গে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূর্ণ হোম করিয়া থাকে। ডোম পুরোহিত মুক্তিমণ্ডপের মধ্যে মুক্তি বা মুক্তা ও ধর্মের পূজা করিয়া থাকে। তারপর ভক্ত্যাগণ সহ পূজার অন্যান্য উদ্যোক্তারা মুক্তিদর্শনের জন্য মুক্তি মণ্ডপে গমন করে। ডোম পুরোহিত মুক্তিমণ্ডপের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিযাই কতকগুলি ছড়া বলে; ছড়াগুলির বিষয়বস্তু 'দ্বারমুক্তি' 'দ্বারভেট' ও 'বৈতরণী'। ছড়া পাঠ হইয়া গেলে সকলে মুক্তিগৃহে প্রবেশ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মুক্তির পূজা করিয়া ধর্মপাদপদ্ম ও মুক্তিমণ্ডপ দর্শন করে। সাধারণ লোকও দর্শনী দিয়া মুক্তিমণ্ডপ দর্শন করিতে পারে। ইহার পর ভক্ত্যারা ঝাঁপ, কাঁটার উপর শয়ন, ইত্যাদি 'সেবা' করিয়া

থাকে। ইতিপূর্বে ডোম পুরোহিত ঝাঁপ কাঁটা ও কণ্টকের পূজা করিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাত্রির পূজা সম্পূর্ণ করিয়া দিলে ডোম পণ্ডিত লুয়ের হাঁড়িতে ও মুক্তিমণ্ডপে চারি প্রহরে চারিবার পূজা করে।

তারপর অর্থাৎ পূর্ণিমার পরের দিন বিসর্জনের পালা। ইহার মধ্যে মুক্তিঘট বিসর্জন ও লুয়ের হাঁড়ি বিসর্জনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিত্রিত মুক্তিমণ্ডপের উপর একটি জীবন্ত হংস বা পায়রা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কোন কোন স্থলে একটি জীবন্ত মাগুর মাছ (clarias Batrachus) ও মুক্তিমণ্ডলের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার ছুটাছুটিতে মুক্তিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। তারপর ডোম পুরোহিত মুক্তি বিসর্জনের কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করে—ইহাতেই মন্ত্র দ্বারা মুক্তিঘটের বিসর্জন হয়, পরে সেই দিনই সেইঘট পুকুরে লইয়া বিসর্জন করিয়া দেওয়া হয়।

এইবার লুয়ের হাঁড়ি বিসর্জনের কথা বলিতে হয়। যে নারী সারা রাত্র লুয়ের হাঁড়িটি কোলে করিয়া বসিয়া, থাকে সে-ই হাঁড়িটি এইবার মাথায় করিয়া লইয়া সকলের সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড সহ পুকুর ঘাটের দিকে অগ্রসর হয়। আরও যে সকল জিনিস বিসর্জন দিবার কথা, যেমন মুক্তিঘট, পঞ্চঘট ইত্যাদি পুরোহিত ও ভক্ত্যাগণ তাহাও সঙ্গে লইয়া তাহার পিছন পিছন যায়। পুকুরের তীরে জলের একেবারে সংলগ্ন হাঁড়িটিকে মাটিতে নামাইয়া রাখা হয়। এইবার ডোম পুরোহিত সংক্ষেপে সমগ্র ধর্মমঙ্গলের কাহিনীটি ছড়ার আকারে আবৃত্তি করে। লুয়ের হাঁড়ি ধারণ কারিণী নারী তাহার স্বামীসহ পূর্বদিকে মুখ করিয়া বসে এবং হাঁড়ির মুখের ঢাকনাটি খুলিয়া ফেলে। তারপর সেই হাঁড়িটি মাটির ঢেলা দিয়া পূর্ণ করে, লুয়ের মুণ্ডটি যাহাতে মাটির নীচে ঢাকা না পড়িয়া যায় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। মাটিতে হাঁড়িটি ওজনে খুব ভারি হয়। একটি প্রদীপ পূর্ব হইতেই জ্বালাইয়া সঙ্গে লইয়া আসা হয়, তাহা ধীরে ধীরে হাঁড়ির মধ্যে নামাইয়া লুয়ের মুণ্ডের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। সর্বক্ষণ সন্তানকামী এই নারী ও তাহার স্বামীকে পূর্বদিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ভক্ত্যাগণ ইতিপূর্বেই জলে নামিয়া একটি খুঁটি পুতিয়া রাখে; লুয়ের হাঁড়িটি মাথায় লইয়া সেই খুঁটিটি পর্যন্ত যায় এবং হাঁড়িটি মাথায় লইয়া ডুব দিয়াই হাঁড়িটি ছাড়িয়া দেয়। মাটির ভারে হাঁড়িটি জলের

নীচে তলাইয়া যায়। তারপর স্নানাদি সারিয়া সকলে মণ্ডপে ফিরিয়া আসে। মন্দিরে ফিরিয়া পরবর্ত্তী ঘরভরা উৎসবের জন্য আর একটি লুয়ে ছাগ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, ইহার সামনের দিকে খুরে একটি লোহার খাড়ু পরাইয়া দেওয়া হয়, ইহা দেখিয়াই সকলে ইহাকে ধর্মের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে বলিয়া চিনিতে পারে—কেহ ইহার অনিষ্ট করিতে সাহস পায় না। ইহা ক্রমে বাড়িয়া উঠিতে থাকবে এবং গ্রামের পরবর্ত্তী ঘরভরা অনুষ্ঠানের সময় ইহাকে লুইয়ে রূপে বলি দেওয়া হয়। ইহার পর ডোম পুরোহিত ছড়া বলিয়া ভক্ত্যাগণের উত্তরীয় ছড়াইয়া দেয়। সেইদিনেই লুয়ের মাংস রন্ধন করিয়া ধর্মঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয়। ইহাতেই ভক্ত্যাগণ পারনা করিয়া থাকেন। সেইদিনই ধর্মমঙ্গলের শেষ পালা গীত হয়। এই অনুষ্ঠানটি আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা আদিম জাতির সূর্য পূজারই একটি রূপ। সূর্যকে প্রসন্ন করিবার জন্য পূর্বে যে নরবলি দেওয়া হইত, তাহাই বর্তমানে লুইয়ে পাঁঠা বলির রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সর্প ও পৃথিবী

প্রত্যেক দেশেরই আদিম সমাজের ব্যবহারিক ও ধর্মজীবনে যে দুইটি বিষয় সকল ঔৎসুক্য আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা প্রথমতঃ সূর্য ও দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী বা ধরিত্রী, সহজ কথায় আকাশ এবং মাটি। সূর্য বা আকাশই ইহাদের মধ্যে প্রধান, কারণ, ইহাই খরা ও বৃষ্টি—অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করিয়া পৃথিবী বা ধরিত্রীর শস্যসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পূর্ববর্তী অধ্যায় আমরা দেখিয়াছি, সূর্য দেবতাকে নানাভাবে প্রসন্ন করিবার জন্য সমাজের কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা দেখা যায়। হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ আদিম সমাজ কর্তৃক উপাসিত এই সূর্যই যে কি ভাবে শিবরূপে কল্পিত হইয়াছেন, তাহাও এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে। মাটি বা ধরিত্রীর পূজাও এ'দেশের আদিম সমাজে একদিন উদ্ভূত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহাও হিন্দু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এ'দেশে নানা রূপ লাভ করিয়াছে। দুর্গা পূজা তাহাদের অন্যতম ; কারণ, দুর্গা পূজা ধরিত্রীরই পূজা, বিভিন্ন দিক হইতে প্রভাবিত হইয়া ইহা আজ বাঙালীর জীবনে এক নূতন রূপ লাভ করিয়াছে।

ধরিত্রী পূজার সঙ্গে সর্প পূজার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ধরিত্রী আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চল ও স্থির, জড়ের তুল্য, ইহার মধ্যে প্রাণশক্তি আছে কি না তাহা অনুভব করা যায় না। কিন্তু আকাশের সূর্য তাহা নহে—কারণ, সূর্যের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট উদয়াস্ত আছে, তাহা প্রভাত কিরণের অরুণালোক ক্রমে মধ্যাহ্ন তেজের দীপ্তির ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত অস্তাচলের রক্তিমাভায় বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং ইহা পৃথিবীর মত নির্জীব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আদিম জাতি চিন্তা করিয়া দেখিল, ধরিত্রীর মধ্যে যদি প্রাণ-শক্তি নাই থাকে, তবে ইহার মধ্য হইতে শস্যরাশি কি করিয়া উৎপন্ন হয় ? সুতরাং ইহার মধ্যেও শক্তি আছে, ইহারও আত্মা আছে। সর্প মাটির নীচে গর্তের মধ্যে বাস করে, সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মাটির উপর সর্বাঙ্গ

আশ্রয় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, আবার মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া একাদিক্রমে দীর্ঘকাল সেখানেই বাস করে, সুতরাং সর্পই ধরিত্রীর প্রাণ-শক্তি (life force) বলিয়া কল্পিত হয়। সেইজন্য পৃথিবীব্যাপী আদিম জাতির মধ্যে সর্পের সঙ্গে উর্বরাশক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হয়। সর্প কেবল মাত্র ধরিত্রীরই উর্বরাশক্তির সহায়ক রূপে কল্পিত হয় না; নারীরও বন্ধ্যাত্ব দূর করিয়া তাহাকেও সন্তান উৎপাদন শক্তিদান করিবার অধিকার সর্পেরই আছে বলিয়া কল্পিত হয়। আধুনিক ফ্রয়েড পন্থী বৈজ্ঞানিকগণও সর্পের সঙ্গে প্রজনন সম্পর্ক আছে বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। সেইজন্য serpent ও fertility কথা দুইটি আদিম ধর্মবিশ্বাসে এক সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলা দেশেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। বাংলা দেশেও সর্পের উপাসনা ধরিত্রীরই উপাসনা। দুর্গামূর্তির হাতের মুঠিতে যে একটি সর্প ধৃত দেখা যায়, তাহা তাহার অস্ত্র মাত্র নহে—তাহা প্রতীক, দুর্গা ধরিত্রীরই রূপ। উচ্চতর সমাজে সর্পপূজা মনসা পূজার যে রূপ লাভ করিয়াছে, তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার ভিতর হইতে এই পরিচয়টিই উদ্ধার করা যাইবে। তথাপি তাহা পৌরাণিক উপকরণ দ্বারা এতই ভারাক্রান্ত যে অনেক সময় সেই পরিচয় অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পশ্চিম বাংলার কোন কোন প্রান্তবর্তী অঞ্চলে এখনও যে গ্রাম দেবতার পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে ধরিত্রী ও সর্প পূজার আদিরূপের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও নানা কারণেই আজ বাংলা তথা সমগ্র ভারতের পল্লীসমাজ শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তথাপি একদিন আঞ্চলিক বা গ্রামদেবতার পূজা কেন্দ্র করিয়া এ'দেশে যে সামাজিক একটি সুদৃঢ় সংহত গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সমাজ যখন গোষ্ঠী-জীবন (community life) যাপন করিত, অর্থাৎ কৃত্রিম বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন দেশের সামাজিক সংহতি বিনষ্ট করিতে পারে নাই, ততদিন সমগ্র ভারতবর্ষেই গ্রাম-দেবতার উপাসনা একটি বলিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছিল। সমাজে তখনও ব্যষ্টি-চেতনা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের যে জন্ম হয় নাই, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে গ্রাম-দেবতা ব্যক্তিবিশেষের আবেদন

বা উপাসনায় কদাচ সাড়া দিতেন না, ব্যক্তির অভাব কিংবা আশা আকাঙ্ক্ষা বলিয়া সেদিন কিছুই ছিলনা, সমষ্টির নিকটই তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করিয়া বাস করিতে হইত। সমাজে সে দিন গোষ্ঠীপতি (chief), নায়ক বা মণ্ডলের একটি বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ক্রমে হিন্দু সামন্তরাজদিগের দ্বারা আনীত ব্রাহ্মণ আসিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের সেই প্রাধান্য লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে প্রধানতঃ মুসলমান ধর্ম বিস্তারের পর হইতেই সেখানেও প্রাচীন সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়া গ্রাম দেবতার উপাসনা লুপ্ত হইয়াছে। কেবল মাত্র পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের আদিবাসী অঞ্চলের সংলগ্ন গ্রামগুলিতে এখনও সেই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও গ্রাম-দেবতার পূজার কিছু কিছু প্রচলন বর্তমান আছে। তাহার ভিতর হইতে এখনও বাংলার লোক-সংস্কৃতির একটি প্রাচীন রূপের পরিচয় উদ্ধার করা যাইতে পারে। হিন্দুপ্রভাব বশতঃ নানা বহির্মুখী উপকরণ ইহাদের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেও ইহাদের যে একটি মৌলিক পরিচয় আছে, তাহা বাঙ্গালী জাতিকে জানিবার পক্ষে সহায়ক। সেইজন্য তাহার একটু বিস্তৃত উল্লেখ করিতেছি।

গ্রাম-দেবতার পূজা প্রধানতঃ ধরিত্রীরই পূজা, কোন কোন স্থলে সর্প পূজার প্রাচীনতম রূপেরও তাহাতে সন্ধান পাওয়া যায়, গ্রামদেবতা মনসা বা সর্পদেবী ও ধরিত্রীরই প্রতীক, গ্রাম-দেবতা ধরিত্রী বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন নামে পূজিত হইয়া থাকেন, কোন কোন স্থলে গ্রামদেবতার নামেই গ্রামের নাম হইয়া থাকেন। নিম্নে বাংলা পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামদেবতার বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে। মানভূম জিলায় এই বিষয়ক প্রাচীনতম বহু উপাদানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় বলিয়া মানভূম জিলা হইতেই এই বিবরণ আরম্ভ করা যাইতেছে।

দারিদ্র্য নাশিনী

বাগ্‌দা মানভূম জিলার একটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম। এই গ্রামে প্রায় সকল নিম্নজাতির বাস থাকিলেও ব্রাহ্মণের বাসই সর্বাধিক, গ্রামের ব্রাহ্মণই জমিদার এবং গ্রাম্য সামাজিক সকল কার্যে ব্রাহ্মণই অগ্রণী।

এই গ্রামের লোকালয় হইতে একটু দূরে অর্জুন গাছের একটি ঘন কুঞ্জের মধ্যে গ্রামের গ্রামদেবতা অবস্থান করিয়া থাকেন। প্রায় শতাধিক বড় বড় অর্জুন গাছ চারিদিক ঘিরিয়া আছে। তাহাদের মধ্যস্থলে অর্জুন গাছের ছায়ায় দুইটি ক্ষুদ্র ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি সিন্দুরলিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার তিন-দিক ঘিরিয়া মাটির ঘোড়া প্রায় দেয়ালের মত উচ্চ হইয়া আছে। একটু সামান্য বেদীর মত স্থানের উপর দেবীর স্থান স্থাপিত। দেবীর নাম দারিদ্র্যনাশিনী। বলাই বাহুল্য যে, ইঁহার প্রাক্তন অনার্য নামটি গ্রামের ব্রাহ্মণ প্রভাবের জন্য দূরীভূত হইয়া তৎপরিবর্তে এই সংস্কৃত নামটি তাহার উপর আরোপ করা হইয়াছে। পূর্ব নামটি কি ছিল, তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই। কারণ, গ্রামের ব্রাহ্মণ বসতি অত্যন্ত প্রাচীন।

এই দেবতার নামে কাশীপুর রাজা দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়াছেন। তাহার আয়ে 'দেওঘরিয়া' পদবীধারী ব্রাহ্মণ নিত্য দেবীর পূজা করিয়া থাকে। বার্ষিক পূজা হয় ১৩ই মাঘ তারিখে। সেদিনের পূজায় যদিও দেওঘরিয়াই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে, সর্দারাপাধিধারী ভূমিজগণও আসিয়া পূজার অন্যান্য কার্যে সহায়তা করিয়া থাকে ও পূজান্তে তাহাদের প্রাপ্য লইয়া চলিয়া যায়। উহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে কাশীপুররাজ কর্তৃক দেওঘরিয়া শ্রেণীর উচ্চতর ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হইবার পূর্বে ভূমিজ শ্রেণীর সর্দারেরাই এই গ্রামদেবতার পূজারী ছিল। বলা বাহুল্য সংলগ্ন গ্রামগুলির গ্রামদেবতার পূজারী এখনও ভূমিজ শ্রেণীর অস্পৃশ্য লোকই। ১৩ই মাঘ বাৎসরিক পূজার সময় বিরাট মেলার অধিবেশন হয়, তাহাতে জুয়াখেলা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রকম আনুষঙ্গিক ব্যাপারই হইয়া থাকে। এখানে আর একটি অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইতে শোনা যায়। দেবতার নিকট অনেকে 'নৃত্য' মানসিক করে এবং বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সময় ব্যবসায়ী নর্তকীদিগকে আনাইয়া এখানে নৃত্য করাইয়া থাকে। ছোটজাতের মধ্যে ব্যবসায়ী এক শ্রেণীর নর্তকী আছে, অর্থের বিনিময়ে মেলায় মেলায় নৃত্য করাই তাহাদের কাজ। বার্ষিক মেলার সময় আর একটি অনুষ্ঠান হয়, তাহা মোরগের লড়াই। এই দেবতার নিকট মুরগী বলি দেওয়া হয় না; গ্রামের

ব্রাহ্মণ প্রভাবই যে ইহার কারণ তাহা বলাই বাহুল্য। মুরগী ব্যতীত অন্যান্য পশুপাখী বলি দেওয়া হয়। দেবতার সম্মুখে একটি কাঠ-গড়াও রক্ষিত আছে। এখানে আগে সন্তানাদির ও রোগমুক্তির কামনায় লোকে ধন্না দিত, এখন দেয় না। আষাঢ় মাসে এখানে একটি বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান হয়। আতপ চাউল, দুধ ও গুড় সহযোগে রান্না হয়, তাহাতে দেবতার ভোগ হয়। ভোগান্তে প্রসাদ সমবেত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ব্রাহ্মণও সেই ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। অনাবৃষ্টির সময় গ্রামের লোক চাঁদা তুলিয়া এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। গ্রামবাসীরা তখন দেবতার নিকট আসিয়া একপ্রকার মাথা কুটে ও দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া উচ্চ চীৎকার করিতে থাকে। কাহারও মানসিক থাকিলে দেওঘরিয়া ব্রাহ্মণগণ বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। দেবীস্থানে একটি হাড়কাঠ পোঁতা আছে, মনে হয় প্রায়ই পাঁঠা বলি হয়।

খুটামুল

মানভূম জিলার পুঞ্চা থানার অধীন লাউলাড়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণের বসতি আছে। এই গ্রামে একটি বাঁধের তীরে কয়েকটি অপরিচিত কণ্টক বৃক্ষের নীচে গ্রামের গ্রামদেবতা অবস্থান করেন। তাঁহার নাম খুটামুল। একটি ভগ্ন জৈন প্রস্তরমূর্তিকে বৃক্ষের নীচে আনিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার চারিধারে অগণিত মাটির ঘোড়া স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। পৌষসংক্রান্তির সময় বার্ষিক পূজা হয়। ১২ই মাঘ তারিখ এখানে বাৎসরিক মেলা বসে, সেই সময় গাজন হয়। গাজন শব্দ মেলা অর্থেই এখানে ব্যবহৃত হয়। দেবতার পুরোহিত সর্দ্দার জাতীয় ভূমিজ শ্রেণীর অস্পৃশ্য লোক। বাৎসরিক পূজার সময়ে মুর্গী, পাঁঠা, হাঁস, কবুতর ইত্যাদি বলি হয়। বারোয়ারীভাবে সমগ্র গ্রামের পক্ষ হইতে যেমন বলি হয়, আবার ব্যক্তিগত মানসিক থাকিলেও যে যাহার অবস্থা মত পশুপাখী বলি দিয়া থাকে, অবস্থায় একেবারে না কুলাইলে মাটির ঘোড়া দেবতাকে উপহার দিয়া থাকে।

শিব ও সূর্য

খুটামূল দেবতার সম্মুখেই একটি হাড়কাঠ পোতা আছে। বাৎসরিক পূজার সময় ব্যতীতও অনাবৃষ্টি, মড়ক ইত্যাদিতেও দেবতার নিকট পূজা ও বলি হইয়া থাক। দেবতা যেখানে অবস্থান করেন, তাহা বাঁধের তীর বলিয়া উচ্চভূমি ; তাহার সংলগ্ন একদিকে বাঁধ, অপরদিকে ধানক্ষেত, অন্য একদিকে অনতিদূরে ডিষ্ট্রিকট্ বোর্ডের পুঞ্চা যাইবার রাস্তা। দেবস্থানটি অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ পূজার সময় ঘাস চাঁচিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। একমাত্র অনাবৃষ্টি, মড়ক ও বাৎসরিক পূজার সময় ব্যতীত গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এই পূজায় বড় একটা উৎসাহ দেখায় না।

বাথান ডাইন

লাউলাড়া গ্রামের সংলগ্ন গ্রাম ধাত্‌কি। গ্রামটি পুঞ্চা যাইবার বড় রাস্তার দুইধারে বিস্তৃত এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতের বাস ইহাতে অধিক। এই গ্রামে ব্রাহ্মণের বসতি নাই, তথাপি লাউলাড়া ও বাগদা গ্রাম অনতিদূরবর্তী বিধায় ব্রাহ্মণের প্রভাব কিছু গ্রামবাসীর উপর পড়িবার কথা, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা পড়ে নাই।

গ্রামের এক প্রান্তে দুই তিনটি সাধারণ বৃক্ষের নীচে এই গ্রামের গ্রামদেবতা অবস্থান করিয়া থাকেন। দেবতার নাম বাথান ডাইন। নামটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। তাহাকে ডাইন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাথান বা গোচারণ ভূমির কল্পিত ডাইনী সম্ভবতঃ গোমহিষ রক্ষার জন্য বহুপূর্বে দেবত্বে পরিণত হইয়া বৃক্ষতলে গ্রামবাসীর পূজা পাইতেছেন। দেবস্থানটি আড়ম্বরহীন, দু একটি প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে, মনে হয় বার্ষিক পূজার সময় তাহারা সিন্দূরলিপ্ত হইয়া থাকে, বর্তমানেও তাহার সামান্য চিহ্ন দেখা যায়। বাৎসরিক একবারই পূজা হয়, পৌষ সংক্রান্তির সময়, সর্দ্দার উপাধিধারী ভূমিজজাতীয় অস্পৃশ্য লোক ইহারও পূজারী। বাৎসরিক পূজার সময়. গ্রামের বারোয়ারী মুর্গী, পাঁঠা, পায়রা ও ব্যক্তিগত মানসিক রূপে এই সকল পশুপাখী বলি হয়। কোন সময়ই এখানে কোন মেলা কিংবা গাজন হয় না। মনে হয়, বাগদা ও লাউলাড়া গ্রামের গ্রামদেবতাদের নিকট এই গ্রামের গ্রামদেবতা একটু

নিষ্প্রভ হইয়া রহিয়াছেন। এই গ্রামের অধিবাসিগণও আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় তাহাদের নিকট অনেকটা হীন, সেইজন্য এই দেবতার ইতিহাস নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

ভাঙ্গানালা

বাগ্‌দার সংলগ্ন পূর্ববর্তী গ্রামের নাম নরেন্দ্রপুর; গ্রামে ব্রাহ্মণ বসতি নাই, বাউরী জাতীয় লোকের সংখ্যাই সর্বাধিক। গ্রামের একপ্রান্তে নাতি বৃহৎ আতাজাতীয় গাছের নীচে গ্রামের গ্রাম্যদেবতা অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নাম ভাঙ্গানালা। তিনি নরেন্দ্রপুরের গ্রামদেবতা হইলেও কলেরা যখন সংক্রামকরূপে গ্রামান্তরেও দেখা দেয়, তখন গ্রামান্তরের লোকও তাঁহার নিকট মারীভয় হইতে নিষ্কৃতির জন্য পূজা দিতে আসে। চারিপার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন কলেরা রোগগ্রস্ত হইলে এই গ্রামদেবতার নিকট রোগমুক্তি কামনায় মানসিক করিয়া থাকে। আরোগ্য লাভ করিলে দেবতার নিকট পূজা দিয়া থাকে। পূজারী বাউরী জাতীয় লোক। গ্রাম্যলোকের বিশ্বাস বাউরীর পূজা ব্যতীত অন্য কাহারও পূজা করিবার অধিকার নাই, তবে সকলেই মানসিক করিয়া অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে। পৌষ সংক্রান্তির সময়ই বার্ষিক পূজা হয়, তাহাতে মুর্গী, পাঁঠা, হাঁস, পায়রা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। মানসিক থাকিলেও এই সকল পশুপাখীই বলি হয়। এই দেবীর কোন মূর্তি নাই; উক্ত আতাগাছের তলদেশটিকেই অদৃশ্য দেবীর অবস্থান ভূমি বলিয়া কল্পনা করা হয় এবং তাহার উদ্দেশে পূজা করা হয়। তবে অন্যান্য গ্রামদেবতার নিকট যেমন মাটির ঘোড়া থাকে, তাহার নিকটও তাহাই আছে। সম্প্রতি বিশেষ কোন একজন ভক্ত অভীষ্ট ফললাভ করিয়া দুইটি বৃহদাকৃতি মাটির ঘোড়া উপহার দিয়া গিয়াছে। সেগুলিই সেইস্থানেই রক্ষিত আছে।

কলেরা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গ্রামের সকলে চাঁদা তুলিয়া এই ভাঙ্গানালার পূজা করিয়া থাকে। স্থানীয় বাউরী জাতি দেবীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে এবং তাহার উপর অগাধ বিশ্বাস পোষণ করে। গ্রাম গ্রামান্তরের কত কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যে দেবীর নিকট মানসিক

করিয়া এই দুরন্ত কালব্যধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহার অসংখ্য কাহিনী তাহারা বর্ণনা করিয়া থাকে। এই দেবীর আর একটি গুণের কথাও শোনা যায়। কেহ যদি কোথাও ভয় পায়, তবে তাহার নিকট মানসিক করিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। তিনি অভয়দাত্রী।

ঝালদা

ঝালদা থানার অন্তর্গত গোপালপুর, বরুয়াডি, চাডালঘুটু ও মহকুদর এই চারিটি গ্রাম প্রধানতঃ কুর্মী মাহাতোদিগের বাস। চারিটি গ্রাম মিলিয়া একটি social এবং religions unit, তাহারা চারিগ্রামে একত্র মিলিয়া সহরুল উৎসব করিয়া থাকে। গাজনও কোনও বিশেষ গ্রামে স্বতন্ত্র না হইয়া একত্রে চারিটি গ্রামের লোক মিলিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই চারিগ্রামের 'শিবথান' গোপালপুর গ্রামে অবস্থিত। সেখানেও কোন শিবমন্দির নাই; একটি 'করম' গাছের নীচে একটি প্রস্তর পড়িয়া আছে। তাহাকেই তাহারা চৈত্রসংক্রান্তির সময় শিব বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। পূজারী নায়া জাতির লোক, গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ নাই। কিংবা কোন ব্রাহ্মণ এই শিবের পূজা করিতে গ্রামান্তর হইতেও আসে না। চৈত্র সংক্রান্তির সময় যথারীতি পাট মাথায় লইয়া নায়া পুরোহিত কিংবা গ্রামবাসীদের মধ্যে যাহারা ভক্ত্যা হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ উক্ত চারিটি গ্রাম পরিক্রমণ করিয়া থাকে। পাটভক্ত্যা হওয়ার কোন রীতি এখন নাই। পূর্বে চড়ক হইত, এখন হয় না; কত বৎসর যাবৎ বন্ধ হইয়াছে, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। একবার চড়ক উপলক্ষে একটি ঘটনা হইয়াছিল, ঘটনাটি এইরূপ—ভক্ত্যা যখন চড়কে ঘুরিতেছিল এবং যথারীতি হাত হইতে ফল ও ফুল নিমন্ত্রিত দর্শকদিগের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, তখন একটা শক্ত জাতীয় কি ফল উপস্থিত হাবিলদার সাহেবের বুকে লাগে। হাবিলদার সাহেব ব্যথা পান। তবে তিনি কিছু মনে করেন নাই, ইহার পরের বৎসর হইতে চড়ক বন্ধ হইয়াছে কিনা তাহা কেহ স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না। তবে ইহা অনেকদিন পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঝালদা থানার নিম্নলিখিত গ্রামগুলিতে এখনও প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির সময় শিবের গাজন হইয়া থাকে, যথা কুরম, বেগুন

কোদর, উরকি, বোকদ, তুলিন (তুলিন গ্রামে দুই জায়গাতে গাজন হয় ঝগড়ি, কদমপুর। কোন জায়গায় এখনও নিয়মিত ভক্ত্যা ঘুরিয়া থাকে। কোন কোন জায়গায় দুই এক বৎসর পর পর ঘুরে। এই সকল গ্রামের অধিবাসী প্রায় সকলই কুর্মী মাহাতো। শিবের গাজন ব্যতীত তাহারা বারোয়ারী উৎসব মুণ্ডাদিগের অনুকরণে সরহুল উৎসবও করিয়া থাকে। শিবের গাজন উপলক্ষে কোন কোন জায়গায় এখনও (বিশেষতঃ বনিয়াদি গ্রামে নিয়মিতভাবে) জিভফোড়া, বাণফোড়া ইত্যাদি হইয়া থাকে।

ঝালদা থানার অন্তর্গত মহকুদর গ্রামের কুর্মী মাহাতোরা ধর্মপূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বৎসরে একবার পূজা হয়। পূজার তারিখ বৈশাখী পূর্ণিমা কিংবা কার্তিক পূর্ণিমা (?) ধর্মপূজা এই গ্রাম কিংবা পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে কদাচ বারোয়ারীভাবে হয় না। গ্রামের অধিকারীর মতে সূর্য পূজাই ধর্মপূজা।

এই অঞ্চলের কুর্মীরা ঘরে ঘরেই মনসা পূজাও করিয়া থাকে। কিন্তু মনসার প্রতিমা গড়িয়া পূজা করে না, কিংবা সিজ মনসারও কোন ডাল তাহারা পুতেনা। তুলসীমঞ্চের নীচে সাধারণভাবে নৈবেদ্যাদি সাজাইয়াই পূজা করিয়া থাকে, পূজা উপলক্ষে হাঁস, পাঠা, বলি হয়। পূজার তারিখ শ্রাবণ সংক্রান্তি। মনসার জাত কিংবা ঝাপান হয় না।

ঝালদা থানার মহকুদাগ্রামে গ্রাম দেবতা পূজায় বড় ধুমধাম হইয়া থাকে। গ্রামের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল, অধিবাসিগণ গালার কারখানায় কাজ করে ও গালার চাষও করে; ইহাতে বেশ অর্থাগম হয়। আষাঢ় মাসের একদিন ধান্য রোপন করিবার অব্যবহিত পূর্বে এই পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই পূজা করিয়া গ্রামবাসীগণ ধান্যরোপণ কার্য আরম্ভ করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে একই দিনে তাহারা প্রকৃতপক্ষে ছয় জায়গায় ছয়টি গ্রাম দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান দেবতাটির নাম জাহেরা (Jahera) কালো রং-এর পাঠা বলি দিয়া এই দেবতার পূজা হয়। এই দেবতা গ্রামের একাংশে নিম, শেওড়া, ঢেলা, চুচ্চু (একপ্রকার বন্য গাছ) প্রভৃতি বৃক্ষের একটি Grove এর মধ্যে অবস্থান করেন। তাহার নিকট মুর্গীও বলি দেওয়া হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই একই দিনে এই গ্রামেরই বিভিন্ন ছয়টি জায়গায় অবস্থিত ছয়টি গ্রামদেবতার পূজা করা হয়। ইহাদের নাম (১) জাহেরা (২) বুচাডারী (৩) দাসকোড়া (৪) মহামায় (ইহা গোপাবপুর গ্রামের সীমায় অবস্থিত, তথাপি হইাকে মহজুদর গ্রামের অধিবাসীরা এই উপলক্ষে পূজা করিয়া থাকে ও মান্য করিয়া থাকে) (৫) বালীপোড়া অথবা আটজা (দুই নামেই তাহাকে ডাকা হয়) ও (৬) কুদড়া খোচা এই সকল গ্রাম-দেবতারা কোন কোন জায়গায় সিন্দুরলিপ্ত প্রস্তরখণ্ডমাত্র, কোন কোন জায়গায় এক বা একাধিক ছোট বড় গাছ, কোন জায়গায় বৃক্ষ ও প্রস্তরহীন কেবল উচ্চভূমিখণ্ড মাত্র,—শেষোক্ত স্থান একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া তথায় পূজার আয়োজন করা—গ্রামবাসীদের বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস সত্য বলিয়াই মনে হয় যে এই সকল স্থানেও পূর্বে বৃক্ষ ছিল, কিন্তু বৃক্ষ কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হইলেও যথারীতি পূজা চলিয়া আসিতেছে। উক্ত ছয়টি দেবতার নিকটই গ্রামবাসীগণের সমবেত চাঁদায় এক একটি করিয়া পাঠা বলি দেওয়া হয়; এতদ্ব্যতীত যদি কাহারও স্বতন্ত্র মানসিক থাকে তবে অন্যান্য বলিও হইয়া থাকে। যদি কাহারও মানসিক থাকে তবে কেবলমাত্র বাণীপোড়া, বুচাডারী, ও দাসকোড়া এই তিন দেবতার নিকটই ঐ উপলক্ষেই মুরগী বলি দেত্তয়া হয়, অন্য কোন দেবতার নিকট রগী বলি দেওয়া হয় না।

আষাঢ় মাসের উক্ত গ্রামদেবতাগণের পূজা ব্যতীতও মাঘ মাসে এই গ্রামে আর এক গ্রাম দেবতার পূজা হইয়া থাকে। তাহার নাম বুড়ো। ধানকাটা শেষ হইয়া গেলে উল্লিখিত দেবতাদিগের মতই তাহারও পূজা হয়।

ধুপন মাহাতো মহকুদর গ্রামের একজন গ্রামবৃদ্ধ। সে নিজের কথা এই বলে—

আমার নাম ধুপন মাহাতো। বয়স ৬০।৬৫ হইবে (আরও বেশী হইতে পারে)। আমি স্মরণাতীত কাল হইতেই মহকুদর গ্রামে বাস করি। আমার পূর্বপুরুষেরাও এই গ্রামেই বাস করিয়া আসিয়াছে। আমরা জাতিতে মাহাতো। কেহ কেহ আমাদিগকে কুর্মী মাহাতোও বলে। ২।৩ বৎসর যাবৎ আমাদের মধ্যে কেহ কুর্মক্ষত্রিয় এই পদবী

লইয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতেছে, তাহারা পৈতা লইতেছে। কিন্তু পৈতা লইলেই কেহ ক্ষত্রিয় হয় না, ডোমকে পৈতা দিলে সে ক্ষত্রিয় হইবে না। আমার পূর্বপুরুষের যাহা ধর্ম ছিল, আমারও তাহাই ধর্ম, আমি পৈতা লইয়া ক্ষত্রিয় হইতে চাহি না। কারণ, আমার পূর্বপুরুষেরা কেহ পৈতা লয় নাই, কিংবা তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়াও দাবী করে না। আমি মুগা খাওয়া ছাড়িতে পারি না; কারণ, পূর্বপুরুষেরা মুর্গী খাইয়া গিয়াছে। আমি বৈষ্ণব গোঁসাইর কাছ হইতে মন্ত্র দীক্ষা লইয়াছি, রামমন্ত্রে গোঁসাই আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন। গ্রামে আমরা কীর্তন করি। কালীর নিকট কিংবা দুর্গার নিকট পাঁঠাও মানসিক করি। সহরুল পরবও করি। গ্রামদেবতার নিকট মুর্গীও বলি দিই। আমার গলায় যে মালাটি দেখিতেছেন, তাহা আমার গুরু আমাকে দিয়াছেন। ইহা কিসের মালা বলিতে পারি না। তবে তুলসীর মালা হইতে পারে (প্রকৃতপক্ষে ইহা তুলসীর মালা নহে)। তুলসী গাছ আমাদের আছে, কেহ বেদী বাঁধাইয়া রাখে, কেহ অমনি রাখে। তুলসীতলায় মনসা ইত্যাদি দেবতার পূজা হয়। আমাদের গ্রামে মুড়া জাতি একঘর আছে, তাহারা কোল বা ভূমিজ, তাহাদিগকে সর্দার বলে। তাহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সামাজিক সম্পর্ক নাই। আমাদের প্রধান জীবিকা চাষবাস। ইহা ছাড়া আমাদের গ্রামের দুই ধারেই অরণ্যাকীর্ণ পাহাড়ের শ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল পাহাড়ে শিমুল, কুল ও কুসুমগাছ প্রচুর আছে। এই সকল গাছে প্রচুর লাক্ষা বা গালার চাষ হয়। কাঁচা লাক্ষা ডাল হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া অনেকে ঝালদায় বিক্রয় করে। তাহাতেও অনেকের অর্থাগম হয়। এক একটা ভাল কুসুম গাছ হইতে বাৎসরিক আয় প্রায় ২,০০০৲ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে। আমি জিলা বোর্ডের ভোটার। আমার স্বজাতীয়দের মধ্যে কেহ কেহ নির্বাচন প্রার্থী হইয়াছে, কংগ্রেস হইতে কেহ কেহ দাঁড়াইতেছে। কিন্তু আমার স্বজাতীয়েরা বড় স্বার্থপর, গ্রামের প্রকৃত উপকার কেহ করে না। আমি স্বজাতীয়কে ভোট দেই নাই।

কালভৈরব

পুরুলিয়া হইতে পুঞ্চা পর্যন্ত জেলা বোর্ডের যে রাস্তা গিয়াছে তাহার

এক মাইল দূরে পুরুলিয়া হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাকবিড়্‌ড়া নামক গ্রামে এক বিরাট জৈন বিহারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে এখনও তিনটি প্রাচীন পাথরের মন্দির কোন রকমে দাঁড়াইয়া আছে। অন্যান্য মন্দির ও ইহার চারিপাশের দেওয়ালের ইঁট ও পাথর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। এই জৈন বিহার হইতে প্রস্তর নির্মিত বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিগুলি সেই ভগ্নস্তূপের উপর নির্মিত একটি জীর্ণ পাথরের দেওয়াল বিশিষ্ট অথচ উপরে খড়ের চাল দেওয়া চালা ঘরে রক্ষিত আছে। তাহাদের মধ্যে একটি দিগম্বর জৈন মূর্তি কাল পাথরে গড়া ও উচ্চতায় ৮ ফুটের বেশি, বিরাট ও সুদীর্ঘ দেহ জীর্ণ খড়ো চাল প্রায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। মূর্তিটি দণ্ডায়মান ও নগ্ন। ইহার চারিপাশে আরও অসংখ্য ভগ্ন ও অভগ্ন জৈন মূর্তি আছে। কিন্তু উচ্চতায় তাহাদের মধ্যে আর কোনটিই দুই ফুটের বেশি নহে। এই বৃহত্তম দিগম্বর জৈনমূর্তিটিই কালভৈরব নামে গ্রামবাসিগণ কর্তৃক পূজিত হয়। এই কাল ভৈরবের নামে কাশীপুররাজ দেবোত্তর জমি দান করিয়াছেন, তাহার আয় হইতে রায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ দৈনিক ইহার পূজা করিবার কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মন্দির ও দেবতাদের অবস্থা দেখিয়া ইঁহাদের দৈনিক পূজার কোন ব্যবস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইনিও প্রকৃত পক্ষে গ্রামদেবতার পর্যায়ে পড়িয়া গিয়াছেন। কেহ তাঁহার নিকট মানসিক করিলে পূজারীকে সংবাদ দিয়া বাড়ী হইতে লইয়া আসা হয়। পূজারী আসিয়া পূজা করিয়া থাকে। অন্যথায় পূজায় বড় আসে না। কোন কোন দিন আসে। সংবাদ পাঠাইয়াও আমরা পূজারীর দর্শন লাভ করিতে পারি নাই। পূর্বরাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল, শোনা গেল, তিনি চাষের কার্য তদারক করিতে গিয়াছেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ কালভৈরবের বিশেষ বাৎসরিক পূজা ও সেই উপলক্ষে মেলা হয়। মন্দিরের মধ্যে একটি পাট ও মাটির ঘোড়া ইত্যাদিও রক্ষিত আছে। পূর্বে বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে ধুমধাম হইত, বর্তমানে বিশেষ কিছু হয় না। ইহা রাজার খাস সম্পত্তির অন্তর্গত বলিয়া গ্রামবাসীরা ইহার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেখায় না। প্রকৃত পক্ষে এই মন্দিরের ২০।২৫ হাত দক্ষিণেই আর একটি অনুরূপ জীর্ণ চালাঘর আছে। এই চালাঘরের মধ্যেও

তিনটি ভগ্ন জৈনমূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে একটি পাটও রক্ষিত আছে। ইহাই গ্রামের বারোয়ারী 'শিবথান'। এখানে ১২ই বৈশাখ তারিখে গ্রামের বারোয়ারী বাৎসরিক শিব পূজা ও তদুপলক্ষে গাজন হয়, এই সময়ে গ্রামবাসিগণ অধিকতর উৎসাহ দেখাইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, কালভৈরব বর্তমানে গ্রামদেবতার পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছেন। 'মন্দিরে'র সম্মুখে একটি কাঠগড়া পোঁতা আছে। বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে এখানে পাঁঠা বলি হয়। এতদ্ব্যতীত গ্রামের কাহারও মানসিক থাকিলেও বলি হয়। গ্রামবাসিগণ বলে, একবার পুরুলিয়ার এক জৈন মাড়োয়ারী এখানে দেবদর্শনে আসিয়াছিল। মন্দিরের দুরবস্থা দেখিয়া এখানে একটি নূতন মন্দির গড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে বলিয়াছিল যে মন্দিরে পশু বলি হইতে পারিবে না। এই সর্তেই সে নূতন মন্দির গড়িয়া দিতে রাজি আছে। কিন্তু গ্রামসাসিগণ ইহাতে সম্মত হয় নাই। মন্দিরেরও সেজন্য কোনও সংস্কার হয় নাই। খড়ো চালের ভগ্ন ঘরেই দেবমূর্তিগুলি রৌদ্রে পুড়িতেছে, বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। গ্রামবাসিগণ ইহারও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়া থাকে, যেমন প্রথমত একবার এক জৈন ব্যবসায়ী বিনাসর্তে এখানে একটি মন্দির গড়িয়া দিতে চাহেন। প্রথমত তিনি একটি খড়ো ঘর করিয়া কালভৈরবের গায়ে একটি উত্তরীয় ও রূপার পৈতা পরাইয়া দেন, ঘরের চালটি মজবুত বলিয়া ছাউনি দিয়া দেন। কিন্তু পরের দিন দেখিতে পাওয়া যায়, ঘরের চাল ফুটা করিয়া দেবতার উত্তরীয় ও রূপার পৈতা ঘরের উপর বটগাছের ডালে ঝুলিতেছে। ঠাকুর মন্দিরের আবদ্ধতা অপেক্ষা উপরের উন্মুক্ত আকাশ ও চারিদিকের খোলামেলা ভালবাসেন।

কালভৈরবের এই ভগ্ন ঘর সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। পাকবিড়্ড়া কালভৈরবের থান হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী পাড়া নামক স্থানে বৈশাখী পূর্ণিমার সময় বৎসরে একবার গাজন হয়। কালভৈরব বলেন, কে কষ্ট করিয়া আর এতদূর গাজন দেখিতে যায়? বরং এখান হইতেই দাঁড়াইয়া ছাদ ফুটা করিয়া তাহা দেখা যাউক। এই বলিয়া তিনি উঁচু হইতে হইতে ছাদ স্পর্শ করিলেন, ক্রমে চাল ফুটা হইল। পূজারী মনে করিল, কালভৈরব এইভাবে বাড়িয়া চলিলে ঘরের চাল একেবারে ধ্বসিয়া পড়িবে; এই ভাবিয়া উঁহার বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য দেবতার মাথায় একটি

লোহার কড়াই উপুর করিয়া দিলেন, তদবধি কালভৈরব আর বাড়িতেছেন না, ঘরের চালও ফুটা হইয়াই রহিল।

মূর্তিটি সম্পূর্ণ অক্ষত আছে, কেবল বাম পায়ের দিকে একটি সামান্য ফাটল দেখা যায়। দুই পায়ের পাথর সামান্য ফুটা ফুটা হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস ক্ষেতে ক্ষেতে অবিশ্রান্ত হাঁটাহাঁটির জন্য তাঁহার পায়ে 'হাজা' হইয়াছে। তিনি ক্ষেত্ররক্ষক দেবতা বলিয়া গ্রামবাসিগণ কর্তৃক কল্পিত হন। এই বিশ্বাস খুবই প্রবল।

গ্রামটিও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার কয়েকটি অংশ; যে জায়গায় কালভৈরবের মন্দিরটি স্থাপিত, তাহাকে 'ঠাকুরান থান' বলা হয়। ইহার আর একটি অংশের নাম 'রায় ডিহি' বা 'রায়তি', সেখানেই রায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পূজারীরা থাকেন।

মনসা

পূর্ব মানভূম অঞ্চলে বাউরীদিগের মধ্যে সর্পদেবী মনসাপূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন মনসার মৃৎপ্রতিমা বা ঘট কিনিয়া আনিয়া প্রত্যেক বাউরীর ঘরেই ইঁহার পূজা করিয়া থাকে। পূজায় কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। নিজেরাই গৃহাঙ্গিনায় মূর্তি স্থাপন করিয়া তাহার সম্মুখে সাধারণ পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়া পূজা করিয়া থাকে। অবস্থা অনুসারে কেহ কেহ বা একটি পাঁঠা বলি দেয়, অবস্থায় না কুলাইলে বলি দেওয়া হয়ও না, কিন্তু পূজা প্রত্যেক বাউরীর ঘরেই এই উপলক্ষে হইয়া থাকে। সিজ-মনসার গাছ উহারা পূজা করে না।

কেওট্‌রাই মনসা পূজার সর্বাধিক ভক্ত। শ্রাবণসংক্রান্তির দিন তাহারাও গৃহে গৃহে ক্রীত মূর্তি বা ঘট স্থাপন করিয়া মহাধুমধামের সহিত মনসার পূজা করিয়া থাকে। পূজায় তাহাদের সর্বাধিক ভক্তি সম্বন্ধে স্থানীয় সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, তাহারা রাত্রি করিয়া বাঁধের মাছ চুরি করিয়া থাকে, কিংবা সময়ে অসময়ে বর্ষায় বাদলে জলেই একরকম জীবন কাটায়, জালের মধ্যেও অনেক সময় সাপ জড়াইয়া আসে, এই সকল কারণে সর্পভয় তাহাদের সর্বাপেক্ষা বেশি, অতএব এই সর্পভয় হইতে পরিত্রাণের জন্য তাহারা

মনসার পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের পূজার প্রকরণ বাউরীদেরই অনুরূপ, সম্ভবতঃ বাউরিরা মনসাপূজা কেওটদিগের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। কেওটরা মনসা পূজার রাত্রিতে সারা রাত্র জাগিয়া মনসামঙ্গল গান করিয়া থাকে। ইহাকে 'মনসার জাত' বলে। ইহার একটি মূল গায়েন থাকে, সে কাহিনীটা গাহিয়া যায়, তাহার কয়েকজন সঙ্গী তাহার পিছনে বসিয়া এই প্রকার ধুয়া ধরে—'কলার মান্দাসে ভাসে বেহুলা সুন্দরী গো।' সঙ্গীতের সুর বড়ই করুণ। 'মনসার জাত' শুনিবার জন্য উচ্চতর বর্ণের লোকও এই উপলক্ষে কেওট বাড়ীতে সমবেত হয় এবং সারারাত্র জাগিয়া তাহাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া গান শুনিয়া থাকে। কোন কোন নিম্ন জাতি নিজেরাও স্বতন্ত্র-ভাবে এই গান গাহিয়া থাকে। ইহা মানভূমের পল্লীজীবনের একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান। এই সঙ্গীতের গান ছাপা হইয়াছে, ইহাদের রচয়িতার নাম ক্ষমানন্দ নামক একজন কবি। ইহা এক রাত্রিতে গাহিয়া শেষ করা হয় বলিয়া সংক্ষিপ্ত—পূর্ববঙ্গে একমাস ব্যাপিয়া গীত হইবার উপযোগী সুদীর্ঘ পদ্মা-পুরাণ নহে। এই পুঁথিতে কেবলমাত্র বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের উপাখ্যান ব্যতীত অন্যান্য পৌরাণিক উপাখ্যান নাই। মনসার জাত নামক সঙ্গীতানুষ্ঠানের একমাত্র বাদ্যযন্ত্রের নাম 'বিষম ঢাকী (বিষাণ ঢাকী ?) ; ইহা শিবের হাতের কল্পিত ডমরুর ন্যায় ; মধ্যস্থলে মুঠি দিয়া ধারণ করা হয়, দুইদিক ছাগলের চামড়ায় মোড়া। বাজাইবার বিশেষ কায়দা আছে।

ডোমদিগের গৃহেও প্রায় অনুরূপ প্রণালীতে আবশ্যিক (compulsory) মনসা পূজা হইয়া থাকে। তবে তাহাদের মধ্যে মনসার জাত হয় না। কেহ কেহ পূজা উপলক্ষে একটি পাঁঠা বলি দেয়, অন্য জীব বলি দিবার রীতি নাই। নৈবেদ্যাদি সাজাইয়া নিজেরাই পূজা করে। কোন কোন সময় নিজেদের পুরোহিত আসে।

মানভূমে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদের অনেকের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নাই। তবে কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সামাজিক খাওয়া দাওয়া চলে। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া চলে, বৈবাহিক সম্পর্ক চলে না। ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ মনসাপূজা নিজেদের বাড়ীতে করে বলিয়া বাহ্যতঃ স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারা বলিয়া

থাকেন যে, ইহা ছোট লোকের পূজা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্পভয় সকলেরই আছে। সেইজন্য প্রায় সকলেই ভিতরে ভিতরে এই পূজা করিয়া থাকে বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রাবণসংক্রান্তির দিনে গৃহাঙ্গিনায় সাধারণতঃ তুলসী মঞ্চের নীচে সিজ মনসার ডাল পুঁতিয়া সাধারণভাবেই এই দেবতার পূজা হয়; তবে বাহ্যিক কোন আড়ম্বর করিতে তাহারা লজ্জা বোধ করে। কোন কোন সময় ছাগ বলিও চলে, তবে সাধারণতঃ তাহা হয় না। কেবলমাত্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণই যে উহা করে, তাহা নহে; কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণও প্রায় এই ভাবেই মনসার পূজা করিয়া থাকে, তবে অনেক সময় তাহারা সিজ মনসার ডাল না পুঁতিয়াই তুলসী তলায় মনসার নামে নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়া থাকে। মেয়েরা সাধারণত এই ব্যাপারেই উদ্যোগী। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের মেয়েরা মনসার নামে উপবাস করে। অন্যান্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণও এইভাবে মনসার পূজা করিয়া থাকে। এখানকার ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে নাগপঞ্চমী ব্রতের প্রচলন একেবারেই নাই।

বাঁকুড়ার ন্যায় মানভূমেও কোন কোনও স্থলে মনসাপূজার সময় ঝাঁপানের প্রচলন আছে। ঝাঁপানকে প্রকৃতপক্ষে 'গুণী' বা ওঝা-সম্মিলন বলা যাইতে পারে। মনসা পূজার পূর্বদিন (শ্রাবণ সংক্রান্তির পূর্বদিন) এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এক বা একাধিক গরুর গাড়ীতে উপযুক্তরূপে ব্যবস্থা করিয়া জিলার বিভিন্ন অঞ্চলের 'গুণী' বা সাপের ওঝাগণ ইহাতে আসন গ্রহণ করিয়া থাকে। তাদের সঙ্গে জীবন্ত সাপও থাকে। সহর বা গ্রামের প্রধান রাস্তা ধরিয়া তাহারা সাপখেলার বিচিত্র কৌশল ও সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে মন্ত্র পড়িয়া মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার বিভিন্ন প্রণালী প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। তৎসঙ্গে প্রায় মনসার জাতের অনুরূপ গানও চলিতে থাকে; গানে এই রকম ধুয়া ধরিতে শোনা যায়,—'বিষ উড়ে উড়েরে মনসার বরে।' কৌতূহলী জনতা পিছন পিছন অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে গুণীদিগের মধ্যে কৃতিত্বের প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে, সেইজন্যই অনেক গুণী জীবন্ত সর্প লইয়া বহু দুঃসাহসিক কার্য করিয়া থাকে। কেহ কেহ সর্বাঙ্গে সর্পাভরণ ধারণ করে, কণ্ঠে সর্পের হার, কটিতে সর্পের মেখলা, বাহুতে সর্পের বাহুবন্ধ, মণিবন্ধে সর্পের কঙ্কণ এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পদ্বারা কর্ণের

কুণ্ডলও পরিয়া থাকে। ইহাকেই বাঁকুড়া ও মানভূম অঞ্চলে মনসার ঝাঁপান বলে; বাঁকুড়া শহরে এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

লাউকুড়ি

শিমুল ও শেওড়া গাছের নীচে প্রস্তরময়ী গ্রাম্যদেবতা। ১লা মাঘ ও আষাঢ় সংক্রান্তির দিন পাঁঠাবলি আবশ্যিক। নায়া বা নায়ক উপাধিধারী জাতির লোক পূজারী; পূজার জন্য তাহাদের জমি দেওয়া আছে। পূজার প্রসাদ ব্রাহ্মণ গ্রহণ করে না। কেবল পায়স দ্বারা দেবীর ভোগ হয়। মানসিক পূজা উক্ত নির্দিষ্ট তারিখ ছাড়া অন্য যে কোন দিনও হইতে পারে। ব্রাহ্মণ পাচক যদি পায়স রান্না করিয়া ভোগ দেয়, তবে ব্রাহ্মণেও প্রসাদ লইতে পারে। বাৎসরিক পূজার সময় নায়া পুরোহিত গ্রামের প্রত্যেক গৃহ হইতে দুগ্ধ, আতপ চাউল ও গুড় সংগ্রহ করিয়া পূজাস্থানে গিয়া পায়স রাঁধিয়া ভোগ দিবে। লাউকুড়ি দেবী একটি নাতিবৃহৎ পাথর। লোকের বিশ্বাস প্রকৃত দেবী মাটির নীচে আছেন, তবে কেহ তাহাকে দেখে নাই। সেই দেবকল্পিত পাথরটির পার্শ্বে লোকে মানসিক করিয়া মাটির ঘোড়া দিয়া থাকে, সেখানে বহু মাটির ঘোড়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। চড়রা গাছ ও শেওড়া গাছের নীচে বৈশাখী বুড়ীর স্থান। যে যে দিন লাউকুড়ীর পূজা হয়, সেই সেই দিনে তাহারও পূজা নায়া জাতির লোকই করিয়া থাকে। তবে তাহার 'থানে' কোন বলি হয় না। পাথরের ঠাকুর, মাটির ঘোড়া নাই।

২।৩ টি অপরিচিত গাছের নীচে বড়পাহাড়ী দেবীর থান। ২রা মাঘ বার্ষিক পূজা হয়, পূজার ব্যবস্থা নায়ারাই করে। একটি পাঁঠা বলি হয়। পাঁঠার মাংস সেখানে রাঁধিয়া নিম্ন জাতির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়; রাঁধা মাংস ঘরে লইয়া যাইবার উপায় নাই। মাটির ঘোড়া নাই। ব্রাহ্মণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। পাঁঠাবলির একটু বিশেষত্ব আছে। বলি হইবা মাত্র একজন নায়া পূজারী পাঁঠার কবন্ধ হইতে রক্ত চুষিয়া খাইতে থাকে, খাইতে খাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে দেবতা তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, অতঃপর অন্যান্য লোকের সহায়তায় তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়।

মানভূম জিলার অন্তর্গত আস্থা নামক গ্রামে গ্রামদেবতার নিকট শূকর

বলি দিবার প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। নায়াজাতির লোকই ইহারও পূজারী।

বেলেঙ্গার

টৈলঘাটির নিকটবর্তী বেলেঙ্গা গ্রামে এক দীর্ঘ শাল গাছের নীচে নীলকণ্ঠবাসিনী নামে এক প্রস্তররূপী গ্রাম্যদেবতা আছেন। কাত্রাস রাজবাটীতে নীলকণ্ঠবাসিনী নামে এক দেবীর পূজা হয়। সেখানে তাঁহার স্বর্ণমূর্তি রক্ষিত আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই স্বর্ণমূর্তি পূর্বে এই গ্রামেই ছিল। পরে একদিন দেবী স্বেচ্ছায় কাত্রাস রাজবাটীতে চলিয়া যান। সেখান হইতে গ্রামবাসীকে স্বপ্নাদেশ দেন যে তাহারা যেন ইহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। স্বর্ণমূর্তির পরিবর্তে প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে কিংবা মৃত্তিকার মূর্তিতে পূজা করিলেও তাহারা দেবীর প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইবে না। তদবধি গ্রামবাসী প্রস্তরের মধ্যেই তাহার পূজা করিয়া আসিতেছে। অস্পৃশ্য নায়াজাতির লোক ইহার পুরোহিত। ১লা মাঘ তারিখে বাৎসরিক বিশেষ পূজার এখানে ব্যবস্থা হয়, তখন বিবিধ পশুবলি হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, পূর্বে এখানে নরবলি হইত। বাৎসরিক পূজা ব্যতীত মহানবমীর দিন এখানে একটি পাঁঠা বলি হয় এবং যদি কেহ মানসিক করে, তবে সেও বৎসরের যে কোন দিন এখানে পূজা দিয়া থাকে। সর্বদাই নায়াজাতির লোককেই পূজারী নিযুক্ত করিতে হয়। যে দিন প্রথম ধান্যরোপণ করা হয়, সেদিনও এখানে সমবেত গ্রামবাসীরা পূজা দিয়া থাকে।

বেলেঙ্গা গ্রামে মাঠের মধ্যে একটি সিন্দূরলিপ্ত পাথর আছে। পূর্বে এখানে একটি জামগাছ ছিল। গাছটি লুপ্ত হইয়াছে, এখন কেবলমাত্র পাথরটি পড়িয়া আছে। মহানবমীর দিন একটি পাঁঠা বলি দিয়া এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করা হয়। যে দিন প্রথম ধান্য রোপণ করা হয়, সেদিনও বিশেষ পূজা ও 'ক্ষীর ভোজন' হয়। পূজারীর নাম লালমোহন খাওয়ান, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

এই গ্রামে কল্যাণেশ্বরী নামে যে আর এক দেবী আছেন তাহারও কোন মূর্তি নাই; পাথরের মুড়ি ও মাটির তৈরী ছোট ছোট ঘোড়া পূজা হয়।

স্থানীয় জমিদার কর্তৃক বিশেষ ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত আছে। এখনও নিত্য পূজা ও পাঁঠা বলি হয়। কোন মন্দির নাই, উন্মুক্ত স্থানে দেবীর বাস।

দেশোয়ালী

মানভূম জিলার ধানবাদ মহাকুমার কেন্দুয়াড়ি থানার অন্তর্গত বেলিয়ারী গ্রামে দেশোয়ালী নামক একটি উচ্চভূমিতে গ্রামদেবতা দেশোয়ালী দেবী অবস্থান করেন। আনুমানিক দুই বিঘা জায়গা জুড়িয়া কয়েকটি শাল ও বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ আছে। তাহাদের নিম্নে কয়েকটি স্থান একটু পরিষ্কৃত করিয়া তাহার একাংশে যূপকাষ্ঠ ও অপরাংশে দেবীর আসন স্থাপন করা হইয়াছে। দেবীর কোন মূর্তি নাই, এমন কি কোন প্রস্তরও দেবীরূপে পূজিত হয় না। প্রধানতঃ বৃক্ষকেই দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী কুর্মী মাহাতো জাতীয় লোক। তাহারা এই দেবীর নিকট নানা মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য পূজা মানসিক করিয়া থাকে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে বৎসরের যে কোন দিন সেই স্থানে পূজোপকরণ লইয়া আসে। নায়া জাতির একজন লোক প্রত্যহ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সেইস্থানে আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। কেহ পূজা লইয়া আসিলে সে-ই তাহাদের নামে দেবীর কাছে পূজা নিবেদন করে। ইহার নায়া জাতির পূজারীর নাম বাবুলাল মালিক। নিকটবর্তী গ্রামেই তাহার বাস এবং এই দেবীর পূজাই তাহার ব্যবসা। পূজার উপকরণ পূজারীর অবস্থানুসারে সামান্য এদিক সেদিক হইলেও সাধারণতঃ এই—মিষ্টদ্রব্য, বাতাসা, সন্দেশ ও সামান্য ফলমূল, সিন্দুর, অবস্থানুসারে কেহ পাঁঠা, ভেড়া কিংবা কেহ মুর্গী বলি দিয়া থাকে। বিশেষ পূজা উপলক্ষে গ্রামের দশজন একত্র হইয়া বৎসরে একদিন মহিষ বলি দিবারও ব্যবস্থা হয়।

এই লৌকিক দেবস্থানেও সম্প্রতি বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। তাহার ফলে দেশোয়ালী থানের সংলগ্ন একটি বৃত্তাকার গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। মাঘ মাসে প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন হয় এবং তাহার সংলগ্ন একটি মাটির ঘরে বৈষ্ণব চিত্রপ্রদর্শনী হইয়া থাকে।

এই গ্রামের শিবথানে একটি গ্রাম্য শিবমন্দির আছে। সেখানে বৎসরে

একবার শিবের পূজা হয়। বাৎসরিক গাজনের তারিখ বৈশাখী পূর্ণিমা কিংবা তাহার ২।১ দিন পর, ধর্মঠাকুরের নাম এখানে অপরিচিত, গাজন উপলক্ষে চড়ক হয়। কিন্তু বানফোড়া কিংবা পিঠে বঁড়শী বিধান এখানে বর্তমানে লুপ্ত হইয়াছে। গাজনের কয়েকদিন পূর্ব হইতেই দলে দলে স্ত্রী, পুরুষ পাট মাথায় করিয়া ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, পুরুষ ও স্ত্রী স্বতন্ত্র দল বাঁধিয়া ঘুরে ; স্ত্রীলোকের দলের মধ্যে একমাত্র ঢাকী ব্যতীত আর কোন পুরুষ থাকে না। গৃহস্থের আঙ্গিনায় পাট নামাইয়া নারীগণও অবাধে পাট ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। নৃত্যের সঙ্গে নানা প্রকার লৌকিক ছড়াও গাহিয়া থাকে।

মারে-কালী

মানভূম জিলার ধানবাদ মহকুমার অন্তর্গত কর্কটা গ্রাম একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী কেওট, এতদ্ব্যতীত বেনে জাতীয় লোকও উহাতে আছে। এই গ্রামের গ্রামদেবতার নাম 'মারে', শুধু তাহাই নহে, কর্কটা গ্রামের চারিপার্শ্বস্থ প্রত্যেক গ্রামের গ্রামদেবতার নামই 'মারে', কখন কখন ইহাকে মারে কালীও বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের মারী কথারসঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে।

আষাঢ় মাসে ধান্য রোপণের পূর্বে 'মারে দেবী'র বারোয়ারী পূজা হয়। পূজায় পাঁঠা ও মুর্গী বলি হয়। মারে দেবীর কোন মূর্তি নাই ; একটি বাঁধান বেদী (পাথর নহে) সিন্দুর লিপ্ত করিয়া উহাতে পূজা হয়। গ্রামের পাড়ে পদবী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পূজা করে। পূজা স্থলে নির্জন মাঠের মধ্যে সম্প্রতি একটি খোলার ছাউনি বিশিষ্ট কোঠাঘর তৈরী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোঠাঘরের মধ্যে কোন দেবতা নাই, কেবল মাত্র সামান্য একটু বাঁধান বেদীর মত, উহাতে কয়েক জায়গাতে সিন্দুরলিপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পূজা বাহিরের বেদীতে হয়, বেদীর নিকটে দুইটি বংশদণ্ডে দুইটি শ্বেতপতাকা উড়িতেছে, অদূরে যূপকাষ্ঠ।

একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করিবার আছে যে, এখানকার গ্রামদেবতার বেদীর নিকট কোন মাটির ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব মনে

হয়, মাটির ঘোড়া একটি স্থানীয় সংস্কার, মানভূম জিলার যে অংশ সাঁওতাল পরগণা ও যে অংশ রাঁচি জিলার সহিত সংলগ্ন, তাহাতে মাটির ঘোড়া একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

'মারে' নামটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। এই মারেই বাংলায় মারী ও মহামারী এবং দক্ষিণ ভারতে মারীঅম্মা —দাক্ষিণাত্যের বিশেষ প্রতিপত্তিশালী গ্রামদেবতা।

মারে দেবতা কর্কটায় কিংবা উহার সংলগ্ন কোন গ্রামে কোন উল্লেখযোগ্য বৃক্ষতলে অবস্থান করেন না, কোন প্রস্তরও যে পূজা হয়, তাহাও নহে, 'মারে'র স্থানে মাটির বেদী নির্মাণ করিয়া সেখানেই পূজা হয়। কোন কোন সময় সাধারণ ঘর তৈরী করিয়া দেওয়া হয়, তাহা ঝড় ঝাপটায় ভাঙ্গিয়া গেলে দেবস্থান কিছুদিন অনাবৃত পড়িয়া থাকে।

এই গ্রামদেবতা গ্রামের সকলের পূজ্য। আষাঢ়ের প্রথম ভাগে সাধারণত কোন শনি কিংবা মঙ্গলবারে (কিংবা অন্যবারও হইতে পারে) গ্রামবাসী এই দেবতার পূজা করিয়া পরে ধান্যরোপণ আরম্ভ করে। এই দেবতার পূজা ব্যতীত ধান্য রোপণ হয় না। পূজায় সাধ্যমত গ্রামবাসী সকলেই চাঁদা দেয়, বারোয়ারী ২।৩টি পাঁঠা খরিদ করিয়া বলি দেওয়া হয়, মানসিকও থাকিলে বলি দেওয়া হয়। বহুদিন যাবৎ মুরগী বলি চলিতেছে বলিয়া এখনও চলে, এই মুরগী সাধারণত তুরী ডোমদিগের মানসিক থাকে; পূজার পূর্বে তিন দিনের মধ্যে যদি গ্রামে কোন মৃত্যু ঘটে, তবে পূজা এই তিন দিন বাদ দিয়া পরে অনুষ্ঠান করা হয়। এই তিন দিন গ্রাম দেবতার পূজা হইতে পারে না।

ভাদুপূজা

মানভূম জিলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লৌকিক উৎসবই ভাদু পূজা। ইহার ইতিহাস একটু বিচিত্র। ভাদু কোন দেবতার নাম নহে, কিন্তু বর্তমানে প্রায় দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে সর্বত্র যে জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই,—

কাশীপুররাজের এক অতি আদরের কন্যা ছিল, তাহার নাম ভাদু; সম্ভবতঃ ভাদ্রমাসে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহার এই নাম রাখা

হইয়াছিল। ভাদুর বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সম্ভ্রান্ত ঘরের রাজকন্যা বলিয়া সহজে তাহার বর জুটিল না, অনূঢ়া অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হইল। রাজা মনে দারুণ আঘাত পাইলেন। কিন্তু তাঁহার আদরের কন্যার স্মৃতি রক্ষার এক অভিনব ব্যবস্থা করিলেন। ভাদ্র মাসেই তাহার মৃত্যু হইল সেইজন্য ভাদ্র মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষদিন পর্যন্ত রাজবাড়ীতে ভাদুর স্মরণার্থ উৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। শুধু তাহই নহে, তাঁহার রাজ্যের সমস্ত প্রজাদিগকেও ভাদুর স্মরণার্থে তাহাদের প্রত্যেকের গৃহে উৎসবানুষ্ঠান করিবার আদেশ দিলেন। কাশীপুর রাজার অধিকাংশ প্রজাই রাজবৃত্তি ভোগী, ব্রাহ্মণেরা প্রায় শতকরা নিরান্নব্বই জন ব্রাহ্মোত্তর ভোগী, কাশীপুররাজ নানা বিষয়ে প্রজাদিগের সুগভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র, কাশীপুর রাজের সঙ্গে প্রজাদিগের সম্পর্কের এই ঐতিহ্য আজিও লোপ পায় নাই। যদিও এ কথা সত্য যে, সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে বিদ্রোহীপক্ষে যোগদানের জন্য কাশীপুররাজের প্রাধান্য অনেকখানি লোপ পাইয়াছে, তথাপি মানভূমের প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে কাশীপুর রাজের নাম পরম শ্রদ্ধার সহিত আজিও উচ্চারিত হয়। শুধু মানভূমই নয়, সিপাহি যুদ্ধের পুর্বে বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে ইঁহার বিস্তর জমিদারী ছিল, সেই সকল তাহার জমিদারী আজ বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, তাহার ভূতপুর্ব প্রজা-বর্গের বংশধরেরাও কাশীপুর রাজের নাম পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। প্রকৃত-পক্ষে কাশীপুররাজই এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দুধর্মকে স্থাপন করিতে একক শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সকল কারণে কাশীপুররাজের আদরের কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ উৎসব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা করিতে আরম্ভ করে। কাশীপুর রাজবাটীতে এখনও ভাদ্র মাসে ভাদুর স্মরণার্থ উক্ত উৎসব নিয়মিত হইয়া থাকে। শেষ তিন দিবস বিরাট মেলার অধিবেশনে রাজবাটী আলোক মালায় সজ্জিত হয়, বহুদুর হইতে পর্যন্ত লোক কাশীপুরের ভাদু উৎসব দেখিতে যায়।

এ'দিকে প্রত্যেকের গৃহেই ভাদ্র মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দিন পর্যন্ত বালিকা ও বধূরা সমবেত হইয়া ভাদুর পূজা করে। পূজায় পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। কোন বয়স্কা মহিলা 'ভদ্রেশ্বর্যে নমঃ' বলিয়া

এক একটি পুষ্প ভাদুমূর্তির দিকে কয়েকবার ছুঁড়িয়া দেয়। একটি মাটির প্রতিমা গড়া হয়। প্রতিমাটি হেমবর্ণা, বীণাহীনা সরস্বতীর অনুরূপ, স্থানীয় কুম্ভকারেরা মূর্তি গড়ে। ভাদুপূজায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা ভাদুর গান। এই সম্পর্কে বহু লোক-সঙ্গীত মুখে মুখে রচিত হইয়া গীত হয়। ভাদুর আগমনী হইতে আরম্ভ করিয়া বিদায় পযন্ত অসংখ্য সঙ্গীত বিচিত্র সুরে গাওয়া হয়। পূজান্তে সংক্রান্তির পর দিবস চোখের জলে ভাদুকে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়।

কেহ কন্যা সন্তান কামনা করিলে এই মনস্কামনা জানাইয়া গৃহে ভাদু আনে; অর্থাৎ ভাদু পূজা করে, কন্যা জন্মিলে নাম রাখে ভাদু। কন্যার বিবাহ হইতে বিলম্ব হইলে, কিংবা সন্তান হইতে বিলম্ব হইলে ভাদুর মানসিক করে। বিবাহ হইলে ধুমধাম সহকারে, পূজা করে, সন্তান হইলে ছেলে কোলে দেওয়া ভাদুর 'পূজা দেয়, এই পূজা মানভূম, বাঁকুড়া, ও বর্ধমানের পশ্চিম অঞ্চলে দেখা যায়, উত্তর বীরভূমে একেবারে নাই।

ভিরকুনাথ

বাঁকুড়া জিলায় শালতোড়া হইতে ৮ মাইল উত্তরে প্রায় দামোদর নদের তীরে রাওতোড়া গ্রাম অবস্থিত। তাহাতে ভিরকুনাথের থান নামে একটি লৌকিক দেবতার থান আছে। জনশ্রুতি এই যে, এখানে বগার হাঙ্গামার সময় (১৭৪৮ খৃঃ) গ্রামের রাউত পদবী বিশিষ্ট জমিদারগণ যখন গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যান, তখন তাহাদের পুরুষানুক্রমিক সঞ্চিত ধনৈশ্বর্য, ও বাসন-কোসন এখানে একটি কূপের মধ্যে প্রোথিত করিয়া তাহাদের ভিরকু নামক একটি বংশধরকেও তাহার সঙ্গে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া 'যক' বা যক্ষ করিয়া গিয়াছিলেন। 'যক্ষ' বা 'যক' করিবার তাৎপর্য এই যে, সে মৃত্যুর পরও এই সকল ধনরত্নের প্রহরী হইয়া থাকিবে। এই 'রাউত' হইতেই গ্রামের নাম 'রাউতোড়া' হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস; ইহা সত্য হওয়া অসম্ভব নহে। স্থানটিতে একটি কূপের আকারে একটি স্থান পাথর দিয়া ঘেরাও করিয়া দেওয়া আছে, তাহার মধ্যে সিন্দুরলিপ্ত প্রস্তররূপী ভিরকুনাথ অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনি রাউতদিগের প্রোথিত ধনরত্ন প্রহরায় নিযুক্ত আছেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

ভিরকুনাথ বাউরীদিগের দ্বারা বিশেষভাবে পূজিত ; ইনি বাউরীদিগের দেবতা বলিলেও চলে। তবে যদি কাহারও গরু হারাইয়া যায়, তবে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ভিরকুনাথের কাছে আস্ত মাসকলাইর খিচুড়ী মানসিক করে, সাধারণ লোকের বিশ্বাস গরু জীবন্ত অবস্থায় থাকিলে, তাহা নিশ্চিতই ফিরিয়া আসিবে। বার্ষিক কোন পূজা হয় না, সকলের মানসিক পূজাই বাউরীই করে। কয়েকটি গাছের নীচে এই প্রস্তররূপী দেবতার স্থান, গাছের মধ্যে তেঁতুল, কদম ও কুচলা গাছ আছে। জনশ্রুতি এই পূর্বোক্ত ঘটনার পর হইতে গ্রাম হইতে রাউতগণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ; তবে তাহাদের অন্যান্য বংশধরগণ নাকি এখনও হিমালয়ের পাদদেশে কোন জায়গায বসবাস করিতেছে। গ্রামের একজন সন্ন্যাসী হিমালয় ভ্রমণ করিয়া আসিয়া গ্রামে সংবাদ দেন যে, তাহার সঙ্গে রাউতদের বংশধরদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভিরকুনাথের কথা তাহাদের স্মরণ আছে, তবে তাহারা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছে যে, ভিরকুনাথ বাউড়ী-দের দেবতা হইয়াছে।

ভিরকুনাথের থানে অনেকে আগে নাকি ধামায় করিয়া মোহরের রাশি শুকাইতে দেখিত, এখন আর দেখে না। আগে গ্রামে যখন কাহারও ঘরে কোন বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রমুখ উৎসবাদি হইত, তখন ভিরকুনাথের নিকট প্রার্থনা জানাইলেই নাকি প্রয়োজন মত বাসন-কোসন এখানে পাওয়া যাইত ; কার্য শেষ হইলেই পুনরায় এখানে আনিয়া ফিরাইয়া দিলেই লোকে দেখিতে পাইত, তাহা পরের দিন অদৃশ্য হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ গ্রামের লোক এই যুক্তি দেখায় যে, আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারি গ্রামবাসীদের কাহারও ঘরে অতিরিক্ত বাসন-কোসন নাই, তাহারা সর্বদাই কাজকর্মের জন্য ভিরকুনাথের নিকট হইতে তাহা পাইত বলিয়া তাহারা নিজেদের গৃহে আর তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখে নাই। কিন্তু একবার এক দুর্বৃত্ত ভিরকুনাথের নিকট হইতে এইভাবে বাসন-কোসন গ্রহণ করিয়া যথাকালে আর ফিরাইয়া দেয় নাই, তদবধি জিনিষ প্রার্থনা করিলেও আর পাওয়া যায় না।

গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেওট, ডোম ও বাউরীর বাস আছে।

জামলালা

মধ্যযুগের কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া যায়।

শালতোড়া গাঁয়ে
বনের নিকটে
নিত্যার আলয় যেথা,
ডাকিনী বাসুলী
নিত্যাসহচারী
বসতি করয়ে সেথা।

এখন শালতোড়া গ্রামে নিত্যার আলয়ও নাই, ডাকিনী বাসুলীরও কোন থান নাই। তবে শালতোড়া গ্রামের প্রান্তে শালবনের কিনারে জামলালা নামে এক গ্রামদেবতা আছেন। পূর্বে একটি জাম গাছের নীচে তিনি থাকিতেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এখন আর জাম গাছ নাই, অন্য একটি বন্য গাছ স্থানটিকে ছায়া করিয়া আছে, তথাপি পূর্বতন জামলালা নামটি আজিও রক্ষা পাইতেছে।

কিছুদিন আগেও দেবী গাছের নীচেই উন্মুক্ত স্থানে বাস করিতেন, শাল-তোড়ায় একজন সাব রেজিষ্ট্রার আসিয়াছিলেন, তিনি নিজ ব্যয়ে সেখানে ক্ষুদ্র একটি মন্দিরের মত করিয়া দিয়াছেন, শিলারূপী দেবতা তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন, কিন্তু এই ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরটি এত সঙ্কীর্ণ যে, ইহাতে মাটির ঘোড়াগুলির স্থান সঙ্কুলান হয় না, সেগুলিকে বাহিরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এখানে বৃহদাকার মাটির ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সাব রেজেষ্ট্রারী আপিশ এখানে আর নাই।

দেবীর নিত্য পূজা হয়, দেওঘরিয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া নিত্য পূজা করে, কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নাই। তবে পূজার্থী হইতে কিছু আয় হয়, তাহা পুরোহিত পাইয়া থাকে। আষাঢ় মাসে বার্ষিক পূজা হয়। বার্ষিক ও মানসিক পূজায় বলি হয়, কিন্তু পাঁঠা ও পায়রাই বলি হয়, মুর্গী হয় না।

গ্রামের লোকের বিশ্বাস এই, দেবীর অনুগ্রহে শালতোড়া গ্রাম কলেরা ও বসন্ত হইতে মুক্ত আছে, কোনদিন এ' রোগ এখানে হয় না, তবে স্থানটি সাধারণতঃ বেশ স্বাস্থ্যকর।

এই জামলালা সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, দেবীর সাত ভগিনী, ভগিনীগণ প্রত্যেকেই নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের গ্রামদেবতা, যেমন শালতোড়ায় জামলালা, ঝন্‌কাগ্রামে বিলাসিনী, শ্যামপুরে কাঁকড় কেয়ারী ও যশোদা, লেদাপসগ্রামে কাজিয়াম, শিখারবিদা গ্রামে বাসুলী এবং উপরগোদা গ্রামে চণ্ডী।

ওলাইচণ্ডী

ওলাইচণ্ডী সাধারণত কলেরার দেবতা, পশ্চিম বঙ্গের অন্যত্রও তাঁহার পূজাস্থান আছে। বিষ্ণুপুর যে বৈষ্ণব ধর্মপ্রভাবিত স্থান, তাহা ইহার মন্দির ও শুধু প্রাচীন গৃহদ্বারগুলি দেখিলেই সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ নিজেরা বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধর্মের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। বিষ্ণুপুরকে দ্বিতীয় বৃন্দাবন বলা হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ বৈষ্ণব প্রভাব সত্ত্বেও সহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে একটি বাঁধের তীরে এক পিপল বৃক্ষের নিম্নে সহরের গ্রাম-দেবতা ওলাইচণ্ডী তাঁহার মাটীর ঘোড়া ও অন্যান্য উপকরণ সহ বিরাজ করিতেছেন। কোন কোন সময় বিশেষতঃ কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে বিশেষ একটি মূর্তি নির্মাণ করিয়া বিশেষ পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও, সাধারণ পূজাদিতে ইহার কোন মূর্তি নির্মিত হয় না। সাধারণ শিলাখণ্ডেই তাঁহার পূজা হয়। পূজায় মানসিককারীরা পাঁঠা বলি দিয়া থাকে, অন্য কোন পশুপক্ষী বলি হয় না। পূজারী নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বৎসরে দুইবার বিশেষ ধুমধাম সহকারে পূজা হইয়া থাকে; সংক্রামকরূপে কলেরা আরম্ভ হইলে এই দুই নির্দিষ্ট তিথি ব্যতীতও পূজা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন একবার পূজা হয়, এই উপলক্ষে সাধারণ মিষ্টদ্রব্য ইত্যাদি সহকারে নিম্নশ্রেণীর পুরোহিতগণ দেবীর পূজা করিয়া থাকে। বলিও হয়। আর একবার পূজা হয় পৌষ সংক্রান্তির সময়, তখনও একই নিয়মে পূজা হয়। বলিও হয়। এতদ্ব্যতীত জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার দিনেও পূজা হয়। উক্ত তিন দিন ব্যতীত কাহারও মানসিক কিংবা মহামারী লাগিলে কোন নিত্য-পূজা হয়।

বিরাট এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড রক্ষিত আছে, উহার

চারিধারে মাটির ঘোড়া। মাটির উনুন কাটিয়া চৈত্র সংক্রান্তিতে যে ভোগ রান্না করা হয়, উহার চিহ্ন বহুদিন পড়িয়া থাকে।

বাশুলী

বাঁকুড়া সহর হইতে ৯।১০ মাইল দূরবর্তী ছাতনা নামক স্থানে বাংলার আদিকবি চণ্ডীদাসের পূজিত বাসুলী দেবীর মন্দির এখনও ভগ্নদশায় পড়িয়া আছে। মন্দিরের বিস্তৃত চত্বরের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টক ও প্রস্তর নানা জায়গায় স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়; তথাপি মন্দির, নাটঘর, মন্দিরের প্রাচীর প্রভৃতির সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। পরিত্যক্ত মন্দির আঙ্গিনার একাংশে একটি সাধারণ পাকা কোঠাঘর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে একটি প্রাচীন শিলামূর্তি ও তাহার চারিদিকে নিয়মিত মাটির ঘোড়া ইত্যাদি রক্ষিত আছে। এই মূর্তি চণ্ডীদাস পূজিত বাসুলির মূর্তি নহে, প্রাচীন মূর্তি বর্তমানে সে স্থান হইতে দুই মাইল দূরবর্তী স্থানীয় জমিদার বা 'রাজা'র বাড়ীতে এক মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেখানে তাহার নিত্য পূজা হয়; পূজার বৈশিষ্ট্য এই যে, 'মাছপোড়া' দিয়া দৈনিক তাহার ভোগ দিতে হয়, 'মাছপোড়া' প্রসাদ দেবীদর্শনপ্রার্থী সমবেত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এখনও বিতরণ করা হয়। এই দেবী 'আয়াতি ইহ স্বর্গপুরাৎ' ইত্যাদি ধ্যানের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্য রক্ষা করিতে দেখা যায়। পরিত্যক্ত মন্দির আঙ্গিনায় যে দেবী রহিয়াছেন, তিনি বর্তমানে সাধারণ গ্রাম্য দেবতার পর্যায়ে নামিয়া গেলেও তাহার এখনও নিত্য পূজা হয়। দ্বিপ্রহরে গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ নিত্য আসিয়া তাহার পূজা করিয়া যায়। পূজার নৈবেদ্য নিতান্ত সাধারণ। যেদিন বর্তমান লেখক উপস্থিত ছিলেন, সেদিন বৈশাখ সংক্রান্তি, বিশেষ দিন উপলক্ষেও সামান্য চিঁড়ে ও পাকা আম দিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। ধ্যানমন্ত্র একই 'আয়াতি ইহ স্বর্গ পুরাৎ' ইত্যাদি; কিন্তু মূর্তিটি এই ধ্যানের সঙ্গে মিলে না, অন্য কোন মূর্তি এখানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন মূর্তি ছাতনার রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই মন্দির আঙ্গিনায় চৈত্রমাসে বাসন্তী পূজার সময়ই 'চণ্ডীদাসের মেলা' নামক আজিও এক মেলার অধিবেশন হয়; এই উপলক্ষে প্রাচীন নাটঘরের পরিত্যক্ত ভিত্তির উপরেই চব্বিশপ্রহর

কীর্তন হয়, সেই সময় মন্দির আঙ্গিনায় উনুন কাটিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবারও আয়েজন করা হইয়া থাকে। বাসন্তী পূজার তিনদিন দেবীর বিশেষ পূজা ও বলি ইত্যাদি এখনও হয়। মন্দিরে কেহ মানসিক করিলে এবং অন্য সময়ও বলি হয়। মন্দির আঙ্গিনায় দুইটি অনুচ্চ স্তম্ভের আকৃতি প্রস্তর পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় প্রোথিত আছে; মনে হয়, ইহা প্রাচীন মন্দিরের কোন ভগ্নাবশেষ মাত্র; কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস, পূর্বে চণ্ডীদাসের আমলে কিংবা যখন এই মন্দিরে প্রাচীন 'বাসুলী দেবী' প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তখন বলির সময় আপনা হইতে প্রস্তর দুইটি ফাঁক হইয়া যাইত এবং তাহাতেই পশুর গলদেশ স্থাপন করিয়া বলি দেওয়া হইত। এই বিশ্বাস স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। এই মন্দিরের সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র পদ্মদীঘি আছে, সংস্কারের অভাবে বুজিয়া আসিতেছে, তবে এখনও গ্রীষ্মকালে জল থাকে। এই পুকুরকে 'বাসুলী বাঁধ' বলে, এই বাঁধেই দেবী বাশুলী তাঁহার 'শাঁখা' পরা হাত দু'খানি জলের উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ। এই কাহিনী সর্বজন পরিচিত; পুনরুক্তি নিপ্রোজন। এই দেবীর অনুগৃহীত শাঁখারীর বাড়ী বিষ্ণুপুর, এখনও তাহার বংশধরেরা সেখানে বাস করে এবং আজিও সপ্তমী পূজার দিন নিয়মিত এক জোড়া শাঁখা দেবী পূজার জন্য উপহার দিয়া যায়। মন্দিরের পশ্চিম দিক ঘেঁসিয়া জেলা বোর্ডের প্রশস্ত রাজপথ, এই পথের অপর পার্শ্বে আরও দুইটি পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়, একটি বুজিয়া গিয়াছে, বর্ষাকালে জল থাকে না, আর একটি ব্যবহারোপযোগীই আছে, সারা বৎসর জল থাকে। এই দ্বিতীয় পুকুরটিকে 'ধোবা পুকুর' বলা হয়। এই পুকুরেই রামী ধোপানী কাপড় কাচিত।

বাসুলী সম্পর্কে এই প্রকার বহু জনশ্রুতি এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। চণ্ডীদাস ও তাহার ভ্রাতা দেবীদাসের স্মৃতি এখনও গ্রামের ইতর ভদ্র সকলের নিকট জাগরূক আছে।

ছাতনা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয়, বাজার, হাঁসপাতাল, রেলষ্টেশন সকলই আছে। গ্রামে জনসংখ্যাও প্রচুর। প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী বিস্তৃত জায়গা জুড়িয়া এই গ্রাম স্থাপিত—ইহার এক এক পাড়ায় (এ'দেশের ভাষায় ইহাকে কুলি বলে) এক এক জাতির লোক

সাধারণত বাস করে, এই প্রকার বামন কুলি, কামার কুলি ইত্যাদি নামক পাড়ায় এই বিস্তৃত গ্রাম বিভক্ত। গ্রামে অন্যান্য কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরও আছে, ইহা ছাড়াও এই গ্রামের সংলগ্ন অন্যান্য গ্রামেও প্রাচীনতা দ্যোতক অনেক চিহ্ন আজিও বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। ছাতনা গ্রামের বসতি অনেক। ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় ও শাস্ত্রজ্ঞ। পুরোহিত ব্যবসায় অনেকের মধ্যে প্রচলিত এবং তাহারা সংস্কৃতজ্ঞ; ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও তাহারা নিষ্ঠাবান্ ও শাস্ত্রব্যবসায়ী। চণ্ডীদাসের ঐতিহ্য এই গ্রাম সর্বপ্রকারে যে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

গ্রামের ধর্মস্থানের মধ্যে আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপ আছে, মাঝে মাঝে বিশেষত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামে বারোয়ারী চব্বিশ প্রহর কীর্তন হয়, এই উপলক্ষে সকলের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় যায়। চণ্ডীদাসের মেলা ও বাসুলী মন্দিরে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে উৎসবাদি ব্যতীত গ্রামের 'কামার কুলি'তে বৈশাখ সংক্রান্তি দিন শিবের গাজন হয়, তবে এই অনুষ্ঠান একমাত্র কামার-কুলির অধিবাসীদিগেরই বারোয়ারী উৎসব, সকল গ্রামের বারোয়ারী অনুষ্ঠান নহে। কামার কুলিতে শিব মন্দির আছে, তাহার সম্মুখে এক তমাল গাছের নীচে 'ভৈরবথান' বা গ্রাম দেবতার আসন। কামার কুলির শিবের গাজনের বিস্তৃত বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

খুদাইচণ্ডী

খুদকুড়ি গ্রামের বাগ্দী পাড়ায় এক বিরাট অশথ গাছের নীচে প্রস্তররূপী গ্রামদেবতা ভক্তপ্রদত্ত মাটির ঘোড়া পরিবৃত হইয়া বাস করেন। বাগ্দী জাতির পুরোহিত তাঁহার নিত্য পূজা করে। মানসিক অনুসারে পাঁঠা, পায়রা ইত্যাদি বলি হয়। বার্ষিক পূজার বিশেষ কোন দিন নাই। সকল প্রকার অসুখ বিসুখেই বাগ্দী ও তাহাদের সমশ্রেণীর লোকই প্রধানত তাহার নিকট মানসিক করিয়া থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক নাই।

খুদকুড়ি গ্রামে আরও একটি লৌকিক দেবী আছেন। একটি ঘন ঝোপের ছায়ায় প্রস্তররূপী দেবতা, তাহার নিত্য পূজা হয়। পূজারী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এই পূজারী আগুরী বাড়ীতে ধর্মরাজ পূজা করিয়া থাকেন। মানসিক

থাকিলে বলিদান হয়, পাঁঠা ব্যতীত অন্য কিছু বলি দিবার নিয়ম নাই, গ্রামমধ্যস্থ আগুরি পাড়ার সংলগ্নই এই দেবীর বাস, তথাপি সকল জাতিরই পূজা দিবার সমান অধিকার আছে। বর্ষাকালে বাৎসরিক পূজা হয়, সে সময়েও বলিদান হয়।

এক ব্রাহ্মণ বাড়ীর খিড়কির পুকুরের তীরে প্রস্তররূপী সর্প দেবতা মনসা গাছের নীচে অবস্থান করিয়া থাকেন। বন্দ্যোপাধ্যায় পদবী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পূজারী, বিশেষ পূজা মাঘ মাসে হয়। গ্রামে ৫।৬টি মনসাতলা আছে— প্রত্যেক পাড়ায় একটি করিয়া। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে এই সকল মনসাতলায় এক একটি সিজ মনসার ডাল পুতিয়া সেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মনসার পূজা হইয়া থাকে। পুজারী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

গ্রামে মহামারী রূপে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইলে শীতলা পূজা না করিয়া গ্রামবাসীরা এই মনসা দেবীরই দেবতারই বিশেষ পূজা করে। এখানে গ্রামদেবতা ও মনসা একাকার হইয়া আছেন।

শ্যামারূপা

বর্ধমান জিলায় দামোদরের উত্তর তীর হইতে অজয় নদের দক্ষিণতীর পর্যন্ত যে বিস্তৃত বনভূমি অবস্থিত রহিয়াছে উহা সাধারণভাবে বাহিরের লোকের নিকট দুর্গাপুরের জঙ্গল ও স্থানীয় লোকের নিকট 'গড়-জঙ্গল' নামে পরিচিত। গড় অর্থে Fort বা কেল্লা। এই জঙ্গলের মধ্যেই বিদ্রোহী ইছাই ঘোষের কেল্লা বা গড় ছিল বলিয়া স্থানীয় লোকের এখনও সুদৃঢ় বিশ্বাস। অজয়নদের দক্ষিণ তীরবর্তী শিবপুর গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি উচ্চভূমিতে একটি প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। অরণ্যের মধ্যে মন্দির সংলগ্নভূমিতে কোন জনমানবের বসতি নাই। দূর গ্রাম হইতে পুরোহিত নিত্য গিয়া দ্বিপ্রহরে পূজা করিয়া ফিরিয়া আসে। সেই মন্দির ইছাই ঘোষ পূজিত শ্যামারূপার মন্দির বলিয়া এখনও চারিপার্শ্বের লোকের বিশ্বাস। সমতল ভূমি হইতে মন্দিরের উচ্চভূমি পর্যন্ত কোন ভক্ত সিঁড়ি বাঁধাইয়া দিয়াছে। মোট ৫০টি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরের মধ্যে অষ্টধাতু নির্মিত আনুমানিক একফুট উচ্চ একটি দুর্গামূর্তি আছে,

মূর্তিটি আধুনিক। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস প্রাচীন শ্যামারূপার মূর্তি মানসিংহ কর্তৃক নীত হইয়া বর্তমানে রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরে অবস্থান করিতেছে। মন্দিরের সম্মুখে হাড়কাঠ আছে উহাতে বলিদান হয়। আশে পাশের গ্রামের লোক শ্যামারূপার নামে পাঁঠা মানসিক করিয়া ছাড়িয়া দেয়, শ্যামারূপার পাঁঠা ক্রমে বড় হইতে থাকে। সুবিধা মত বিশেষত মহাষ্টমীর দিন শ্যামারূপার নিকট ইহাকে বলি দেওয়া হয়। মন্দিরের চারিদিক দিয়া খাল কাটা ছিল, এখন বুজিয়া আসিয়াছে। এই জঙ্গলকে কেহ শ্যামারূপার জঙ্গলও বলে। একটি অত্যন্ত প্রবল জনশ্রুতি এই যে, অষ্টমী পূজার দিন গড় জঙ্গলে শ্যামারূপার মন্দিরের দিক হইতে পর পর তিনটি কামানের মত আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। এই আওয়াজ শুনিয়া চারিদিককার গ্রামের লোক নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধি পূজায় বলিদান করে, পূজার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া সকলে এই শব্দ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। চারিদিক-কার গ্রামে শক্তিধর্ম অত্যন্ত প্রবল। নিকটবর্তী ফরিদপুর থানার অন্তর্গত কেন্দলো গ্রামে 'মহিষমর্দিনী' নামক প্রাচীন দুর্গামূর্তি আছে। সেখানেও নিত্যপূজা ও দুর্গা পূজায় বিশেষ উৎসব হয়। এই সকল শাক্ত ধর্মকেন্দ্র থাকিবার ফলেই এই অঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম বা ধর্মঠাকুরের পূজা তত প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

ঘাগর বুড়ী

বর্ধমান জিলায় আসানসোল সহর হইতে তিন মাইল পূর্বে কালী পাহাড়ী ষ্টেশনের পশ্চিমে নির্জন কঙ্করময় প্রান্তরের মধ্যে শীর্ণকায় নুনিয়া নদীর ধারে এক বন্য বৃক্ষের নীচে ঘাগর বুড়ী দেবী অবস্থান করেন। ১লা মাঘ তারিখে এই মাঠের মধ্যে বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। আসানসোল সহরের সরকারী আদালত, স্কুল অফিশ ইত্যাদিতে অর্ধেক দিন কাজ হয়, সহর হইতে মেলা পর্যন্ত বিশেষ যান-বাহনের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘাগরবুড়ী গ্রামদেবতা সন্দেহ নাই, তথাপি নিত্যপূজা হয়, 'চক্রবর্তী' উপাধিধারী অনুচ্চ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ এই দেবতার দেয়াসী বা পূজারী, প্রায়ই বলি হয়। জনশ্রুতি এই যে, দেবীরা সাত ভগিনী, উহারা প্রত্যেকেই

নিকটবর্তী সাতটি গ্রামের গ্রামদেবতা। (বাঁকুড়া জিলার শালতোড়া গ্রামের জামলালার কথা স্মরণীয়)। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও এই সাত ভগিনীর নাম কিংবা উহাদের গ্রামের নাম সন্ধান করা গেল না। জনশ্রুতিটি প্রাচীন, অতএব লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি বহুল প্রচলিত আছে—একবার এক বরযাত্রের দল সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, কিন্তু হুনিয়া নদীর তীরে আসিয়া যখন পোঁছিল, তখন দেখিল, নদীতে বান ডাকিয়াছে। খরস্রোতে বানের জল বহিয়া যাইতেছে; নদী অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। এ'দিকে বিবাহের লগ্ন অতীত হইয়া যায়; সকলে ঘাগরবুড়ীর নিকট মানসিক করিল, যদি লগ্ন থাকিতে তাহারা বিবাহ বাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারে, তবে ঘাগর বুড়ীর নিকট পূজা দিবে। অমনি বান চলিয়া গেল, নদীর জল কোথায় অন্তর্হিত হইল। বরযাত্রের দল নদী পার হইয়া লগ্ন থাকিতেই বিবাহ বাড়ীতে পৌঁছিল, নির্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু তাহারা ঘাগরবুড়ীর পূজা দিতে ভুলিয়া গেল। ঘাগর বুড়ী ইহার প্রতিশোধ লইলেন। যখন তাহারা সেই পথ দিয়া পুনরায় ফিরিতেছিল, তখন দেবী তাহাদের সকলকে নদীতে চুবাইয়া রসাতলে পাঠাইয়া দিলেন, কেহ তাহাদের আর সন্ধান পাইল না।

১লা মাঘ যে মেলা হয়, সেই উপলক্ষে সাঁওতাল নাচ হয়। সার্কাসের দল পর্যন্ত বসিয়া যায়।

৫।৭ বৎসর পূর্বে এখানে কোন মন্দির ছিল না, সম্প্রতি কোন ভক্ত গাছের নীচে সামান্য একটি মন্দির করিয়া দিয়াছেন। প্রস্তররূপী দেবতাকে তাহার ভিতর রাখা হইয়াছে।

কল্যাণেশ্বরী

বর্ধমান জেলার পূর্ব সীমান্তে বরাকর নদের তীরে ও বরাকর ষ্টেশনের এক মাইলের মধ্যবর্তী স্থানে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির, এই মন্দিরের সংলগ্নই কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড় ও একদিকে বরাকর নদ, স্থানটি পূর্বে অরণ্যাকীর্ণ ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। একদিকে আসানসোল মহকুমা ও অন্যদিকে ধানবাদ জিলার সীমানা। এই অঞ্চলে ইহা একটি প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে।

এই মন্দিরেই দুই মাইল দক্ষিণে বরাকর তীরে যেখানে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বরাকর নদ অতিক্রম করিয়াছে, সেই স্থানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বেগুনিয়ার তিনটি রেখ দেউল আজিও অক্ষত অবস্থায় পড়িয়া আছে। মনে হয়, বরাকর নদের এই তীর ধরিয়া কিছু দূর পর্যন্ত স্থান একটি ধর্মকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কল্যাণেশ্বরীর কোন মূর্তি নাই, একটি প্রস্তরস্তূপকে একখণ্ড রক্তবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয় এবং তাহাই দেবীর স্থান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। দুই তিনটি সুগঠিত মন্দির, পাঁচিল ঘেরা মন্দিরের আঙ্গিনা ইত্যাদি আছে। কাশীপুর রাজের দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে নিত্যপূজা চলে।

নিত্যপূজা ত হয়ই, নিত্য বলিও হয়। এমন জনশ্রুতি আছে যে, কোন দিন যদি কেহ পাঁঠা লইয়া পূজা না দিতে আসে, তবে অদূরবর্তী পাহাড় হইতে একটি পাঁঠা কল্যাণেশ্বরীর নামে আপনা হইতেই নামিয়া আসিবে, পুরোহিত তাহাকেই বলি দিবে, পাঁঠা বলিরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। মন্দিরের নিকট কোন জনমানবের বসতি নাই, পুরোহিত রাত্রিতে মন্দিরে থাকে।

দেবমূর্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত বলে, দেবী বিমুখ হইয়া আছেন, সেইজন্যই তাহাকে দেখা যায় না। বস্ত্রাচ্ছাদনের এক অংশ একটু তুলিয়া পুরোহিত দেখায়, অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিমুখ হইবার কারণ সম্বন্ধেও গল্প আছে—তাঁহার রক্তপিপাসা এতই প্রবল যে, তিনি একবার নিত্য বলির অভাবে তাঁহার পুরোহিতের কন্যাকেই চিবাইয়া খাইতে থাকেন, সেই অবস্থায় পুরোহিত আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলেন, তদবধি দেবী লজ্জায় বিমুখ হইয়াছেন। পূর্বে হিন্দু দেবী ছিলেন না বুঝিতে পারা যায়, পরে হিন্দুপ্রভাবের যুগে হিন্দুনামকরণ হইয়াছে।

এই দেবী সম্বন্ধে আরও জনশ্রুতি এই যে, পঞ্চকুটের কাশীপুররাজ এই দেবীকে কোথা হইতে লইয়া আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে এখানেই দেবীর থাকিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল, কাশীপুর পর্যন্ত আর গেলেন না। তদবধি তিনি এখানেই পূজিতা হইতেছেন।

কল্যাণেশ্বরীর শাঁখা পরা সম্বন্ধেও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তাহা ছাতনার বাশুলীদেবীর শঙ্খ পরিধানের কহিনীর সম্পূর্ণ অনুরূপ।

শিবপুর গ্রামের বাগ্দীদিগের ধর্মাচার

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত শিবপুর গ্রাম বাগ্দী প্রধান। এই গ্রামের কৃষিজীবী বাগ্দীদিগের ধর্মাচার নিম্নে বর্ণনা করা গেল—

(১) গ্রামের পশ্চিম সীমায় শুঁড়ি পুকুরের ধারে (পুর্বে এই অঞ্চলে শুঁড়িরা বাস করিত, সম্ভবত পুকুর তাহারা কাটাইয়াছিল, এখন শুঁড়িরা লোপ পাইয়াছে) একটি বাঁধান অনুচ্চ বেদীতে মহাদানা বা মহাদানব নামক দেবতার স্থান। কোন মূর্তি নাই, আনুষঙ্গিক মাটির ঘোড়া ইত্যাদি সকলই আছে। ইনি বাগ্দীদিগের নিজস্ব দেবতা; ১লা মাঘ তারিখে (এই তারিখকে বাগ্দীরা 'এথিন দিন' বলে) এখানে বাৎসরিক পূজা হয়। পূজারী বাগ্দী, কোন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না, পুজোপলক্ষে মুর্গী, হাঁস, ছাগল ইত্যাদি বলি হয়, মানসিক থাকিলে বাৎসরিক পূজা ব্যতীতও অন্যান্য দিনও বলি হয়, বাগ্দীরাই এখানে মানসিক করিয়া পূজা দিয়া থাকে। নিত্য পূজা হয়, বাগ্দী দেয়াসী নিত্য পূজা করে। বার্ষিক পূজাও বাগ্দীই করে, সেই উপলক্ষে পচাই বা দেশী মদের ভোগ দেওয়া হয়। নিত্য পূজাও পারিবারিক পালাক্রমে চারি মাস করিয়া তিনটি বাগ্দী পরিবার নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। মাঘমাসে বাৎসরিক পূজায় দেশী মদ্যসহ বিশেষ ভোগের বন্দোবস্ত আছে। মানসিক করিয়া লোক মাটির ঘোড়া উপহার দিয়া থাকে। মহাদানার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এই গল্প প্রচলিত আছে।—

একবার একজন মুসলমান তাহার অপবিত্র খাবারের থালা এই মহাদানব থানের নিকট নামায়। বাগ্দীরা নিষেধ করে, কিন্তু উক্ত মুসলমান তাহা শুনে না; রাত্রে এই মুসলমান বাড়ী ফিরিতেই তাহার দুইজন আত্মীয় সহসা কলেরায় প্রাণত্যাগ করিল এবং তাহার উপর দেবতার স্বপ্নাদেশ হইল যে, সে যদি একটি শূকর কাঁধে করিয়া মহাদানার থানে লইয়া গিয়া তাহাকে নিজ হাতে বলি না দেয়, তাহা হইলে তাহারও রক্ষা নাই। অগত্যা মুসলমান তাহাই করিল। মহাদানা তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

লোকে দেবতার নিকট যে মাটির ঘোড়া দিয়া যায়, তাহা পরের দিন ভাঙা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাদানা রাত্রি করিয়া সেই ঘোড়ায় চড়েন, ফলে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়।

মহাদানা প্রতি রাত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া শিবপুর হইতে দামোদরপুর যাতায়াত করেন। দামোদরপুর শিবপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী। দামোদর পুরেও মহাদানব থান আছে। একবার এক সাধু তাহাকে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে দেখিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গ্রামে বাগ্দীদিগের নিজস্ব মনসা থান, কালী ও ভৈরব থান আছে, কোন শিবথান নাই। মনসা থানে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মূর্তি বিসর্জন হইয়া গেলে শূন্য বেদীতে নিত্য পূজা হয়। কার্তিক অমাবস্যায় কালী-থানে কালীপূজা ও সেই সময়ই ভৈরব থানে ভৈরব পূজা হয়। সর্বত্র পূজারী বাগ্দী। পশু বলি হয়। এই তথ্যাবলী রসরাজ বাগ্দী দেয়াসী কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি হইতে গৃহীত।

কালীপুর গ্রামের মনসা

সিউড়ী থানার অন্তর্গত কালীপুর গ্রামে সুবলচন্দ্র ধীবর দেয়াসীর বাড়ীতে এক সুবৃহৎ বকুল গাছের নীচে একটি খড়ো ঘরে এক মনসার মন্দির আছে। বেদীতে তিনটি সিন্দুরলিপ্ত সিজ মনসার ডাল শুদ্ধ সাধারণ বীরভূমী মনসার মূর্তি। মূর্তি তিনটির নাম (১) হংসবাহিনী, (২) চিন্তামণি, (৩) মনসা। প্রত্যেকের গায়ে দৃশ্যত পিতলের মত পেরেক বিদ্ধ, ইহাদিগকে 'চিক্' (মনসার চিক্) বলে। সাধারণত কার্তিক পূজার দিন সিদ্ধাভীষ্ট ভক্তেরা তাহা দেবীকে উপহার দিয়া থাকে। দেয়াসী একজন উত্তম সাপের ওঝা বলিয়া পরিচিত ; অন্যান্য রোগেও ঔষধাদি দিয়া থাকে।

দেবীর সম্মুখে বকুল গাছের নীচে একটি হাড়কাঠ পোতা আছে। মানসিক থাকিলে নিত্য পূজা ও দশহরার সময় বার্ষিক পূজায় পাঁঠা বলি হয়। বকুল গাছের ডালে ও মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য চাঁদমালা ঝুলান আছে।

বার্ষিক পূজা—দশহরার দিন (জ্যৈষ্ঠ কিংবা আষাঢ়) ব্রাহ্মণ পূজা করে।

বিশেষ পূজা—চৈত্র মাসের এক শনি কিংবা মঙ্গলবার ব্রাহ্মণ পূজা করে।

নিত্য পূজা—কেয়ট পুরোহিত পূজা করে, তবে যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহার মানসিক পূজা দিতে চায়, তবে তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিয়া পূজা দিতে পারেন। শিউড়ীর কেউট দেয়াসী এক ব্রাহ্মণকে নাকি এই

বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল যে, যদি আমার দ্বারা তোমার পূজা মনঃপূত না হয়, তবে তুলসীতলায় পূজা দিয়া যাও, মনসার মন্দিরে আসিও না।

নিত্যপূজার বিধি ব্রাহ্মণ লিখিয়া দিয়াছে, তাহাতে 'অপবিত্র পবিত্রো বা' হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদিক পৌরাণিক সকল মন্ত্রসহ 'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং পর্যন্ত সকলই আছে। কেওট দেয়াসী ভুল উচ্চারণে তাহাই কোন মতে মুখস্থ করিয়া লইয়া নিত্য পুজা চালায়। তাহার মনসার ধ্যান যথা, 'দেবীমম্বাং শশধর-বদনাং চারুকান্ত্যাং বদান্যাম্' ইত্যাদিও আছে।

দশহরার দিন বাৎসরিক পূজায় মনসাকে পুকুরে নিয়া স্নান করান হয়। তখন পিছন পিছন মনসার বন্দনাসূচক গান গাওয়া হয়, তাহাকে 'চালান' বলে। গানের দুইটি পদ এই, 'পূজ পূজ বিষহরী ! মাকে দিয়েছে জবা, করেছে শোভা, আ মরি মরি।' এই সঙ্গে পদ্মাপুরাণের অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে রামায়ণ এবং বৈষ্ণব বিষয়ক গানও গাওয়া হয়। বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে 'বিষম ঢাকী' বাজাইয়া মনসার 'জাত' গাওয়া হয়। তাহাতে লক্ষীন্দর বেহুলার করুণ কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া কেওটগণ আমাদিগকে অতি মধুর 'মনসার জাত' গাহিয়া শুনাইল—কালীনাগের লৌহবাসরে প্রবেশের প্রসঙ্গ বিষয় ঢাকীর তালে অতি মিষ্ট লাগিল।

ব্রহ্মদৈত্য

শিউড়ী সদর মহকুমার অন্তর্গত নগরী নামক গ্রামে এক ভেলা গাছের নীচে ব্রহ্মদৈত্য নামে এক অপদেবতার একখানি বাঁধান বেদী আছে ; কোন দেবতা কিংবা শিলামূর্তি কিছুই নাই, শূন্য বেদীতে দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া পূজা করা হয়। এই অপদেবতার নামে বর্ধমান মহারাজের সামান্য দেবোত্তরও আছে। দেবোত্তরের আয় হইতে নিত্য পূজা ও বার্ষিক পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। নিত্যপূজা স্থানীয় এক ব্রাহ্মণই করিয়া থাকেন। বাৎসরিক পূজাও কণ্ডে গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশীয় উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় করিয়া থাকেন।

১লা মাঘ তারিখে মাঠের মধ্যে গাছের নীচে বাৎসরিক পুজা হয়,

সেই উপলক্ষে বলি (নিত্য পূজাও মানসিক থাকিলে বলি হয়) ও চণ্ডীপাঠ হয়। বিশেষ শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া থাকেন। সকল জাতির লোকই পূজায় যোগদান করেন। ইহা বলাই বাহুল্য যে, বর্ধমান রাজের দেবোত্তর থাকিবার ফলেই ইহার প্রতি ব্রাহ্মণ যেমন আকৃষ্ট হইয়াছেন, তেমনি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধাও আকৃষ্ট হইয়াছে। এই দেবতার উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—

একবার এক ব্রাহ্মণ এই পথ দিয়া কাটোয়ায় গঙ্গাস্নান করিবার জন্য যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে বসিলে এক মলিন ছিন্ন বসন পরিহিত ভীষণ দর্শন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ অস্বীকার করেন। তথাপি অপরিচিত ব্যক্তি নিরস্ত হন না। অগত্যা ব্রাহ্মণ স্বীকার করেন, ফিরিবার পথে তাহাকে সঙ্গে লইবেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া আসেন, কিন্তু ফিরিবার পথে অন্য পথ ধরেন ; অন্য পথেও সেই অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পুনরায় দেখা হয়, ব্রাহ্মণ নিজের কথা রক্ষা করেন নাই বলিয়া লজ্জিত হন, অপরিচিত ব্যক্তিও তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত করিয়া অন্তর্হিত হন। তখন ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারেন যে, ইনি দেবতা, এই ভাবিয়া তাঁহার সহিত প্রথম যে জায়গায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইখানে গিয়া পুনরায় তাঁহার পূজা করিতে থাকেন। এই ভাবে তাহার পূজা চলিয়া আসিতেছে।

গ্রামের লোক নিশীথ রাত্রে গ্রামের পথে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পায় ; তখন গ্রামবাসী বুঝিতে পারে, ব্রহ্মদৈত্য ঠাকুর ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে-ছেন। কেহ কেহ নির্জন রাত্রে খড়মের শব্দও শুনিতে পায়, বৃষ্টি হইলে পরের দিন কাদার উপর খড়মের দাগ দেখা যায়। ইহা এই ব্রহ্মদৈত্যর খড়মের চিহ্ন বলিয়া গ্রামবাসীর বিশ্বাস।

১লা মাঘ অর্থাৎ পৌষের ফসল ঘরে আনিবার পর (post-harvest) ধরিত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ধরিত্রী রূপিণী গ্রামদেবীর বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই দেবতা হিন্দু প্রভাবের যুগ হইতেই ব্রহ্মদৈত্য বলিয়া পরিচিত হইলেও, ১লা মাঘ তাঁহার বাৎসরিক পূজা দেখিয়া ইহাকেও ধরিত্রীরই একটি রূপ বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক।

বুড়ীমা

শিউড়ীর অদূরবর্তী গ্রাম কড্ডে বা কয়াধ্যা, ইহাতে একটি মনসার 'মন্দির' আছে। একটি মাত্র বীরভূমী প্রচলিত মনসা 'মূর্তি' বেদীর উপর স্থাপিত আছে, তাহা সিন্দুর ও 'চিক্' দ্বারা শোভিত। দেবতার নাম 'বুড়ীমা', মনসা নহে।

দেয়াসীর নাম নফর মণ্ডল (সদ্‌গোপ চাষ ব্যবসায়ী), নিত্যপূজা হয়। নিত্যপূজা করেন একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বার্ষিক পূজা হয়।

চৈত্রমাসের ২০শে তারিখের পর যে শনি কিংবা মঙ্গলবার পড়ে, তাহাতে বিশেষ পূজা হয়। এই বিশেষ পূজাও ব্রাহ্মণই করিয়া থাকেন। নিয়মিত বলি ইত্যাদিও হয়। বার্ষিক পূজা উপলক্ষে নিয়মিত মনসার জাত ইত্যাদিও হইয়া থাকে। গ্রাম্য দশজনের চাঁদায় বার্ষিক পূজার খরচ কুলায়, কোন দেবোত্তর কিংবা ব্রহ্মোত্তর নাই।

গুহ্যকালী

বীরভূম জিলার ভদ্রপুর গ্রামে মহারাজ নন্দকুমারের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রকাশ, এখনও রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের অনতিদূরবর্তী এক নির্জন স্থানে, (পুর্বে নিকটেই রাজবাড়ীর শ্মশান ছিল বলিয়া অনুমিত হয়) এক কালীমন্দির আছে। মন্দিরটি অসম্পূর্ণ, কেবল গর্ভগৃহের নির্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে, তথাপি ইহা নিসন্দেহে দুইশত বৎসরের প্রাচীন হইবে।

এই মন্দিরের মধ্যে এক অভিনব কালীমূর্তি আছে, নাম গুহ্যকালী। নিকষোজ্জ্বল কালো পাথরে গঠিত মূর্তি। উচ্চ বেদীর উপর সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া একপাশে ফণার আকৃতিতে মস্তক ন্যস্ত করিয়াছে, সেই সর্পকুণ্ডলীর উপর পদ্মাসীনা (পদ্মফুলের আসন নহে—যোগাসন) কালীমূর্তি। কটিদেশ বেষ্টন করিয়া একটি সাপ—উন্মুক্ত নাভির কাছে লেজ ও মাথায় পাক খাইয়াছে। দেবী দ্বিভুজা, দুই হস্তে বর ও অভয়। সর্পের কঙ্কণ ও সর্পের বাজুবন্ধ, কাণের কুণ্ডলরূপে দুই শব ঝুলিতেছে—শবকুণ্ডলা (তান্ত্রিকের আরাধিতা)। লোল

রসনা দাঁতে চাপিয়া আছেন, আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু, মাথায় সর্পমুকুট ; পুরোহিত বলে, সহস্র সর্পের ফণা মুকুটে নিবদ্ধ আছে।

পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে মন্দির, অদূরে মহাশ্মশান ; কিন্তু বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না, বলিয়াই মনে হয়।

লোকশ্রুতি এই, ইনি মহারাজ জরাসন্ধের গৃহদেবতা ছিলেন, মহারাজ নন্দকুমার ইহাকে কাশী হইতে এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

ভূত

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি হইতে দুইদিন ব্যাপিয়া বীরভূম জিলার নানা জায়গায় ভূত পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মাল, বাগ্দী, হাঁড়ি, বাউরী, প্রভৃতি নিম্ন জাতির মধ্যেই এই পূজার প্রচলন আছে। পূজায় ছাগ, মেষ, মুর্গী প্রভৃতি বলি হয। সারারাত ও সারাদিন ধরিয়া ইহারা নিজেরাই ভূতের দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা করিয়া থাকে ; ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দরকার হয় না, পূজার সময় ঢাক ও কাঁসর বাদ্যে কান ঝালাপালা হইয়া যায়। পূজা করিবার সময় দেয়াসীদের মধ্যে 'ভর' নামে এবং কোন্ 'ভূত' তাহার উপর ভর করিয়াছে, তাহারা তাহা বলে ; ভূতের বহু বিভিন্ন নাম আছে। 'ভর' হইলে অনেক স্ত্রীপুরুষ দেযাসীর নিকট নিজ নিজ অভিলাস জ্ঞাপন করিয়া ফলাফল জানিতে চাহে এবং সে যাহা বলে তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়—প্রকৃত ভূতের নিকট হইতেই তাহারা জবাব পাইয়াছে বলিয়াও সরলভাবে বিশ্বাস করে। তাহাদের ভূতের নাম এই স্থানে প্রদত্ত হইল,—অকুল রায়, পাহাড় ঠাকুর, মহাদানা, চোরদানা, ফেঁসেরা, শিরকামোস্না, বাণসিংহ, নারসিংহ, দোদাল সিংহ, পলওয়ান সিংহ, মালঞ্চে, মোহনগিরি, গর্ভকোঙার, বাঘরাই, চণ্ডী, খান্দুরিয়া, বেড়ারদানা, বেড়ার মহাপুরুষ, কানা মেঝেন, বোঙা বোঙি, মা শ্মশানবাসিনী।

বকা পঞ্চমী

বকা (ভাদ্র মাসের শুক্লা) পঞ্চমী তিথির তিন চারি দিন পূর্বে দেয়াসীকে স্নান করাইয়া আর্দ্র বস্ত্রে মনসার মন্দিরের মধ্যে মনসার সম্মুখে পূজাসনে বসাইয়া

দেওয়া হয়। তাহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া মন্দির হইতে নিক্রামণের একমাত্র দরজাটি বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শুধু তাহাই নহে, দরজাটির উপর কাদামাটি লেপিয়া দিয়া ইহাকে একেবারে শীলমোহর করিয়া দেওয়া হয়। বাহির হইতে মনসার গান গাওয়া হইতে থাকে, তাহার দুইটি পদ এই প্রকার :—

'এক যুবতী বলে আমার বেউলার পতি ভাল।
কাণার কপালে পড়ি জনম দুখে গেল॥'—ইত্যাদি

বলা বাহুল্য, ইহা মনসা-মঙ্গলের অন্তর্গত বরবেশী লক্ষীন্দরকে দেখিয়া নারীগণের পতিনিন্দার নিতান্ত পর্যুষিত প্রসঙ্গ। তিন চারি দিন দিবারাত্র এইভাবে মনসা-মঙ্গল গাওয়া হইতে থাকে। যেদিন বকা পঞ্চমী তিথি, সেদিন দ্বিপ্রহর হইতে বাহিরের লোক সেই কাদামাটি লেপা দরজার উপর ঠুক্ ঠুক শব্দ শুনিতে পায় বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা মনে করে, মনসার আশ্রিত সর্পেরা মুখ দিয়া দরজার উপর ঠোকর দিতেছে, যাহাতে দেয়াসী মুক্তি পাইতে পারে; ইহারা দরজা খুলিয়া দিতে চায়। ক্রমশঃ বদ্ধদরজার ঝাপটা খুলিয়া পড়িয়া যায় ও দেয়াসীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়। দেয়াসীকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিয়া শুশ্রূষা করা হয়, ক্রমে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে। অনুষ্ঠান সেদিনকার মত শেষ হয়।

মনসা দুই জাতীয়, (১) সাঁওডালে মনসা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ইহার পূজা হয় ও (২) ভাদুলে মনসা, ভাদ্র সংক্রান্তিতে ইহার পূজা হয়।

কুম্ভকার তাহার চাকে বিভিন্ন প্রকারের হাঁড়ি প্রস্তুত করিবার কালে দৈবাৎ যদি তাহাতে সাপের ফণার আকৃতি কিছু গড়িয়া তুলে, তাহা হইলে সেই কুম্ভকার তাহার সেই হাঁড়ি দৈবোদ্দিষ্ট মনে করে এবং তাহাতে আরও কয়েকটি সুস্পষ্ট সর্পফণা গড়িয়া তোলে, এইভাবে হাঁড়ির চারিদিক ঘেরিয়া ৫।৭টি সাপের ফণা গড়ে। ইহাই মনসা। কুম্ভকার এইভাবে তিনটি পাঁচটি কিংবা সাতটি (বেজোড় সংখ্যা) মনসা গড়িয়া তাহা পণিতে পুড়াইয়া কোন পুকুর কিংবা বাঁধের জলে বিসর্জন করিয়া দেয়। কুম্ভকার ইহার পর হইতে কুম্ভকার বৃত্তি পরিত্যাগ করে, এবং অন্য বৃত্তি গ্রহণ করে। তাহার উপরই দেবতার বিশেষ অনুগ্রহ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া সে নিজের মনে এক দিক দিয়া যে রকম

প্রসন্ন হয় আবার গ্রাম্য সমাজেও সে দৈবানুগৃহীত বলিয়া সম্মান লাভ করে। বীরভূমে অনেক কুম্ভকার পদবী বিশিষ্ট এমন লোক আছে, যাহারা সগর্বে প্রকাশ করে, তাহাদের চাকা চালাইবার হুকুম নাই। ইহা হইতেই লোকে ইহার তাৎপর্য বুঝিয়া লয়। তাহারা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করে।

তারপর যাহার উপর দেবীর অনুগ্রহ হয়, তাহার উপরই স্বপ্নাদেশ হয় বলিয়া বিশ্বাস। সে দেয়াসী হইয়া সেই নিমজ্জিত 'মনসা' বলিয়া পরিচিত হাঁড়িগুলি জল হইতে তুলিয়া আনিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করে ও নিত্যপূজা করিতে থাকে। ক্রমে চারিদিকে এই বিষয় প্রচারিত হয় এবং দেবতার নিকট মানসিক পূজা পড়িতে আরম্ভ করে। অর্থ সংগ্রহ করিবার বাসনা হইলে কিংবা গ্রামান্তরে কোন সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে দেয়াসী মনসাকে মাথায় লইয়া গ্রামান্তরে কিংবা রোগাক্রান্ত গ্রামে যায়। গ্রামবাসীরা ভীতও সশঙ্কচিত্তে দেবীর অভ্যর্থনা করিয়া পূজা দিয়া দেয়াসীকে সন্তুষ্ট করিয়া দেবতাসহ দেয়াসীকে বিদায় দেয়। যে গ্রামে মনসা যেদিন যায় সে গ্রামে সেদিন এটি একটি বিশিষ্ট ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। লোকজন; কাজকর্ম ফেলিয়া দৌড়াইয়া আসে দেয়াসীর উপর দেবতার 'ভর' হইয়াছে—দেয়াসী এমন অভিনয় করে; যে কোন পথে হেলিয়া দুলিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, বিনীত গ্রামবাসীর করজোড় ও স্তুতিবাচন শুনিয়া 'তুষ্ট' হইলে এক জায়গায় 'মনসার ঘট' নামায়, গ্রাম-বাসীরা সেইখানেই মনসার পূজা দিয়া তাহাকে সাধ্যমত তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। এক গ্রামে পূজা শেষ হইলে দেয়াসী দেবীকে মাথায় করিয়া অন্য গ্রামে যায়। দেয়াসীর মাথায় চড়িয়া যে গ্রামে দেবী যান, সেই গ্রামের লোকের বিশ্বাস দেবী স্বেচ্ছায় সে গ্রামে গিয়াছেন; অতএব সেই অনুযায়ী তাহাকে তুষ্ট করিবার দায়িত্বও স্বেচ্ছায় গ্রামের আপামর সকল অধিবাসীই গ্রহণ করে; কোনরূপে দেবী অসন্তুষ্ট হইলে গ্রামের আর উপায় নাই, ইহাই গ্রামবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া দাঁড়ায়। মনসার দেয়াসী নিম্নজাতির লোকই হয়।

চিন্তামণি মনসা

জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধর্মস্থানই চিন্তামণি মনসার বাড়ী। জয়দেব পূজিত রাধা-মাধবের মন্দির অপেক্ষাও ইহা স্থানীয়

অধিবাসীর নিকট জনপ্রিয়। এক হাত আন্দাজ উচ্চ ৬টি মাটির হাঁড়ির গা কুদিয়া কতকগুলি সাপের ফণা বাহির করা হইয়াছে। উপরের দিকে হাঁড়ির মুখ খোলা, তাহাতে পূজাকালীন জল দেওয়া হয় ও সিজমনসার পাতাশুদ্ধ ডাল রাখিয়া দেওয়া হয়। ফণাযুক্ত ছয়টি হাঁড়ির ছয়টি নাম, প্রত্যেক নামই মনসার অর্থবাচক। ইহাদের কেন্দ্রস্থলে বেদীর উপর উক্ত প্রকারের একটি সর্পফণাযুক্ত হাঁড়ি স্থাপন করা হইয়াছে, উহার নামই চিন্তামণি, ইহা আদ্যোপান্ত সিন্দুর লিপ্ত ; চারিদিক ঘেরিয়া কোন ভক্তের দান একটি রূপার হার ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পিতলের কতকগুলি কাঁটা (পেরেক বা Nail) ইহার সর্বাঙ্গে বিঁধাইয়া দেওয়া আছে, এইগুলিও সিদ্ধাভীষ্ট ভক্তদিগের দান। বাগ্দী বাড়ীতে ছোট টিনের দোচালা ঘরই এই চিন্তামণির মন্দির, ঘরের সম্মুখে উঠোন, উঠোনের মধ্যে হাড়কাঠ পোতা, প্রায় নিত্যই মানসিক বলি পড়ে। দেয়াসী বাগ্দী, নাম বাবুলাল দেবাংশী, বয়স আনুমানিক ৬০ বৎসর। উঠোনের দুই ধারে আর দুইটি টিনের ছোট দোচালা ঘর, ইহাই বাগ্দী দেয়াসীর পুরুষানুক্রমিক ভদ্রাসন। পুরুষানুক্রমিক ইহারা দেবীর দেয়াশী, কয়েকপুরুষ আগে কি ভাগে তাহার পূর্ববর্তীরা এই দেবীকে লাভ করিয়া এখানে স্থাপন করিয়াছে, তাহা সে বলিতে পারে না। তাহার আর কোন বৃত্তি নাই, সপরিবারে সে এই বাড়ীতে বাস করে, স্ত্রীকন্যা পুত্রবধূরা মন্দির মার্জনা করে, সে প্রত্যহ পূজা করে, এই আয়েই তাহার সংসার চলিয়া যায়, অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় না। দেবতার কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নাই।

মনসা কয়টির এই নাম—

(১) চিন্তামণি

(২) পদ্মকুমারী

(৩) জলডুবুরী

(৪) বিষহরী

(৫) মনসা, এইটি প্রকৃত হংসবাহনা দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) ষষ্ঠটির নাম বলিতে পারে না।

লৌকিক বিশ্বাস এই যে, সাধারণত মনসারা পাঁচ ভগ্নী কিংবা সাত ভগ্নী এই প্রকার বেজোড় সংখ্যায় একত্র হইয়া বাস করেন, কিন্তু এখানে ছয়ভগ্নী

থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেয়াসী বলিল, এক ভগ্নী বিষ্ণুপুর গ্রামে চলিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুপুর অজয়ের দক্ষিণতীরে বর্ধমান জিলার অন্তর্গত গ্রাম। অবশ্য বিষ্ণুপুর গ্রামে তিনি প্রকৃতই আছেন কি না তাহা কেহ কোনদিন সন্ধান করিয়া দেখে নাই, কিংবা উহার প্রয়োজনও বোধ করে নাই।

দেবীর সম্মুখে প্রায় নিত্যই পূজায় মানসিক বলি হয়। পাঁঠা ভিন্ন অন্য কিছু বলি হয় না।

দেয়াসী সাপের একজন ভাল ওঝা বলিয়া গ্রাম্যলোকের বিশ্বাস। সর্প দংশনের ঔষধও দেয়; বসন্ত, কলেরা, জ্বর, হাম ইত্যাদির ঔষধ দেয়, বিনিময়ে নিজে কিছু লয় না, কেবল দেবীর নিকট পূজা দিতে হয়।

দশহরার দিন বার্ষিক বিশেষ পূজা হয়, সেদিন বাগ্দী দেয়াসী কোন পূজা করে না, গ্রামের ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ আসিয়া পূজা, হোম ইত্যাদি করে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যখন এই দেবীর নিকট মানসিক পূজা শোধ করে, তখন গ্রাম হইতে ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিয়া পূজা করায়, বাগ্দী দেয়াসীর দ্বারা পূজা করায় না, কিন্তু একই মূর্তির নিকট পূজা হয়। নিম্নজাতির মানসিক পূজা বাগ্দীই করে।

বৎসরে একদিন এই দেবীকে মাথায় লইয়া দেয়াসী সংলগ্ন অন্যান্য গ্রামে যায়। যে গ্রামে যায়, সেই গ্রামের লোক দেয়াসীর চারিদিকে ছুটিয়া আসে, করজোড়ে উহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, গ্রামের বাদ্যকর ডোমেরাও ঢাক লইয়া ছুটিয়া আসে, দেয়াসীর উপর দেবতার 'ভর' হইয়াছে দেয়াসী এমন অভিনয় করে। দেবী দেয়াসীর মাথা হইতে 'নামিতে চাহেন না'। তারপর গ্রামবাসীর বহু স্তবস্তুতি, ধূপ ধুনা ও বাদ্যভাণ্ড 'গ্রহণ' করিয়া গ্রামবাসীর প্রতি তুষ্ট হইয়া তিনি দেয়াসীর মাথা হইতে একস্থলে অবতরণ করেন। সেখানে গ্রামবাসী মহা-ধুমধামের সহিত দেবীর পূজা করে, বলি দেয়; দেবী গ্রামবাসীর উপর প্রসন্ন হইয়া এইবার একইভাবে গ্রামান্তরের সীমানায় পদার্পণ করেন। 'চিন্তামণি আসিয়াছে, চিন্তামণি আসিয়াছে' বলিয়া গ্রামবাসী ছুটিয়া যায়। এইভাবে চারি পাঁচটি গ্রাম ঘুরিয়া চিন্তামণি আবার নিজের মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলে মনসা পূজায় যোগদান করে।

গ্রামান্তরে যখন কলেরা কিংবা বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন দেয়াসীর

নিকট আসিয়া সেই গ্রামের লোক প্রার্থনা জানাইলে সে নিজেই দেবীকে মাথায় করিয়া সেই গ্রামে লইয়া যাইবে। সেখানে এক জায়গায় নামাইয়া (কাহারও গৃহে নহে) মহাধুমধামের সহিত তাহার পূজা করা হয়। পূজান্তে দেয়াসী দেবীকে মাথায় করিয়া পুনরায় 'মন্দিরে' লইয়া আসে, পথিপার্শ্বস্থ লোক মাথা নোয়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়।

দেবমূর্তিগুলি প্রত্যহ নূতন সিজ মনসার পত্রযুক্ত ডাল দিয়া সাজাইয়া দেওয়া হয়। আনুষঙ্গিক মাটির ঘোড়া ইত্যাদি মন্দিরের মধ্যে যথাযথই আছে ; বহুদূর হইতে লোক পাঁঠা লাইয়া আসে। সেদিন একব্যক্তি অজয়ের অপর তীরে ৮ মাইল দূরবর্তী জগন্নাথপুর নামক গ্রাম হইতে এক পাঁঠা লইয়া দেবী পূজার জন্য আসিল। অজয়ের তপ্তবালু দ্বিপ্রহর রৌদ্রে পার হইয়া উহাকে যাইতে হইবে। পুত্রের জন্য মানসিক ছিল, পরের দিন সেই পুত্রের বিবাহ, দেবীপূজা না করিয়া বিবাহ হইতে পারে না, সেইজন্য এমন সময় এইভাবে আসিয়াছে। একটু অসময় হইয়া গেলেও দেয়াসী তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাহার জন্য পূজা করিয়া পাঁঠা বলি দিয়া দিল। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার জাত হয়, তাহাতে বৈষ্ণবগণও যোগ দেয়, গ্রামান্তরের কেওটরাও আসিয়া এখানে গান গায়। পূর্বে ঝাঁপান হইত, একবার ঝাঁপান উপলক্ষে এক ব্যক্তি সর্পদংশনে মারা যায়, তদবধি তাহা বন্ধ হইয়াছে।

দুর্গোৎসবে ধরিত্রীপূজা

বাঙ্গালীর শারদীয় দুর্গোৎসবের মধ্যে বিভিন্ন যুগের যে সকল বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণ আসিয়া একত্র সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য ; মনে হয়, মুলত ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই উৎসবের সর্বপ্রথম স্চনা হইয়াছিল—তাহা দুর্গাদেবীর শস্যসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পরিকল্পনা। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' দুর্গাকে শাকম্ভরী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; ইহার অর্থ যিনি শাক (vegetation) বা তরুলতার সম্পদ দ্বারা পৃধিবীকে ভরিয়া রাখেন। কৃষিভিত্তিক সমাজের মধ্যে শাক বা vegetation-এর যে একটি বিশেষ মূল্য আছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং কৃষিজীবী বাংলার বৃহত্তর সমাজ-মানস

হইতে ইহার যে দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে শাক বা শস্যসম্পদের বিশেষ সম্পর্ক থাকিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু কালক্রমে কৃষিনির্ভর সমাজের একান্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া এই উৎসব যখন সামগ্রিক জাতীয় উৎসবে পরিণতি লাভ করিল, তখন ইহার উপর বাহির হইতে নানা উপকরণ আসিয়া মিশ্রিত হইতে লাগিল, তাহার ফলে ইহার মৌলিক পরিচয় আজ অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার আচারগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এখনও ইহার ভিতর হইতে ইহার এই মৌলিক পরিচয়টি উদ্ধার করা যায়।

দুর্গাপ্রতিমার পার্শ্বে যে একটি নবপত্রিকা বা কলা বৌ আনিয়া স্থাপন করা হয়, তাহাই যদি দুর্গাপ্রতিমার আদিরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে কিছুমাত্র ভুল হয় না। কারণ নবপত্রিকার প্রতিষ্ঠাই এখনও দুর্গা পূজার প্রথম পালনীয় আচার। নবপত্রিকা নিম্নলিখিত নয় জাতীয় বৃক্ষ ও শস্য দ্বারা রচিত হইয়া থাকে, যথা—কদলী, কচু, হরিদ্রা, যব, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মানকচু ও ধান্য; এখানে ফল বা শস্য সেই জাতীয় বৃক্ষেরই প্রতীক্। এই নয় জাতীয় বৃক্ষের মধ্যেই দেবীকে সর্বপ্রথম ষষ্ঠীর দিনে উদ্বোধন করা হইয়া থাকে—এই নয় জাতীয় বৃক্ষ কিংবা শস্যের উপাসনা দিয়াই দুর্গাপূজার সূচনা হয়। ইহাদের প্রত্যেকেরই উপাসনা সম্পর্কিত বিভিন্ন আচার পালন করা হয়। যেমন বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ, কিংবা শস্যকে এখানে প্রথমেই পবিত্র জলে আনুষ্ঠানিকভাবে ধৌত করিয়া লওয়া হয়। প্রথমত নবপত্রিকাকে শঙ্খজলে ধৌত করা হয়। তারপর প্রত্যেকটি শস্য কিংবা বৃক্ষকে স্বতন্ত্র করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে জল আনিয়া তাহা দ্বারা ধৌত করা হয়; যেমন উষ্ণ প্রস্রবণের জলে কদলী, পুষ্করিণীর জলে কচু, শিশিরের জলে হরিদ্রা, পুষ্পজলে যব ইত্যাদি। ইহা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আরও পূর্ব-বর্তী কালে সমাজে এই সকল বৃক্ষ ও শস্যের স্বাধীন ভাবে পূজা হইত। যে ঋতুতে যে শস্যের ফলন হইত, সেই ঋতুতে সেই শস্য গৃহে আনিয়া প্রথম আহার করিবার পূর্বে সমাজে গোষ্ঠীগতভাবে কতকগুলি আচার পালন করা হইত। এখনও বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে যে সকল আদিবাসী বাস করিয়া থাকে, তাহারা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন শস্যোৎসব পালন করিয়া থাকে। বাংলার

দুর্গোৎসবের নবপত্রিকার পরিকল্পনার মধ্যে এদেশের বিভিন্ন ঋতুর শস্যোৎসব এক সঙ্গে আসিয়া মিশ্রিত হইয়া এই উৎসবকে একটি অখণ্ড জাতীয় রূপ দান করিয়াছে। সুতরাং নবপত্রিকার মধ্যে যে সকল বৃক্ষ কিংবা শস্য স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা যে শরৎ ঋতুতেই বাংলাদেশে জন্মায় তাহা নহে, তবে অধিকাংশ বৃক্ষ কিংবা শস্যই বর্ষান্তে নূতন জীবন লাভ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। তখন ইহাদের দিকে তাকাইয়া আশা ও আশ্বাসে সমাজের হৃদয় ভরিয়া উঠে, শরৎকালীন এই উৎসবের ভিতর দিয়া সমাজ-মনের সেই আশাই অভিব্যক্তি লাভ করে।

যাহা হউক, দুর্গা পূজা আরম্ভ হইবার সূচনাতেই নবপত্রিকাকে উপরোক্ত প্রণালীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধৌত করিয়া লইবার পর অর্থাৎ 'স্নান' করাইবার পর ইহাকে সম্বোধন করিয়া পুরোহিত যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহার নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নবপত্রিকা অর্থাৎ নয় জাতীয় বৃক্ষ ও শস্যকেই এখানে চণ্ডী বা দুর্গা বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে, ইহার সঙ্গে সিংহ-বাহিনী মহিষমর্দিনী দুর্গার কোন সম্পর্ক নাই, সে সম্পর্ক আরও পরবর্তী কালে স্থাপিত হইয়াছে। এই মন্ত্র বলিয়া নবপত্রিকার উদ্বোধন করা হয়, 'হে চণ্ডিকে তুমি উত্তিষ্ঠ হও, হে জননি, তুমি সত্বর মণ্ডপে প্রবেশ কর, তুমি জাগ্রত হও, হে নবপত্রিকে, তুমি কল্যাণদায়িনী, যতক্ষণ পূজার অবসান না হয়, ততক্ষণ মন্দির-মধ্যে স্থিত হও, হে চণ্ডিকে, তুমি জাগ্রত হও, আমাদিগকে মণ্ডপের পথে লইয়া চল, মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া আমাদের পূজাকালে তুমি অধিষ্ঠিত থাক।'

এ কথা সকলেই জানেন, বোধনের দিনে বাহিরে বৃক্ষতলে নবপত্রিকার মধ্যেই দেবীর উদ্বোধন হয়; তারপর ইহা মন্দিরে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইলে দেবীর প্রতিষ্ঠা করা হইল বলিয়া গণ্য করা হয়। নয় জাতীয় বৃক্ষ ও শস্যই কালক্রমে একসঙ্গে নবপত্রিকার রূপে পূজিত হয়, তারপর সমাজের ধর্মচেতনার ক্রমবিকাশের ধারায় সেই নবপত্রিকাই নারীরূপে পূজিত হইতে আরম্ভ করে—সমাজের এই প্রবৃত্তিকে ইংরেজিতে anthropomorphisation বলা হয়। এই প্রবৃত্তি হইতেই আমরা সিজ মনসা গাছকেও মনসার নারীরূপ দিয়াছি, তবে চণ্ডী বা দুর্গার নারীরূপের মধ্যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে আরও উপকরণ আসিয়া মিশিয়াছে।

যাহা হউক, মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমার পার্শ্বে নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠার পরও বিভিন্ন ধ্যানমন্ত্র দ্বারা নবপত্রিকার প্রত্যেকটি বৃক্ষ ও শস্যকে স্বতন্ত্রভাবে পূজা ও ধ্যান করা হয়—নবপত্রিকার মধ্যেই ইহাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জিত হয় না। আবাহন, প্রণাম ও ধ্যান মন্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাদের প্রত্যেকটিকেই দুর্গার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বলিয়াই কল্পনা করা হইয়াছে। কদলী বৃক্ষকে এই বলিয়া আবাহন করা হয়, ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্রি ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছ।' অর্থাৎ 'হে রম্ভাবৃক্ষে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মাণি, তুমি এখানে আইস।' ইহাকে এই মন্ত্র বলিয়া ধ্যান করা হয়,

ওঁ দুর্গাদেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।
রম্ভারূপেণ সর্বত্র শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে॥'

অর্থাৎ 'হে দুর্গে' তুমি আইস, এই স্থানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কর, কদলী বৃক্ষের রূপে তুমি আমাদের কল্যাণ কর।' এখানে কদলী বৃক্ষকেই দুর্গা বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হইল।

বাংলার লৌকিক ধর্মজীবনে কেবলমাত্র যে নবপত্রিকার মধ্যেই কদলী বৃক্ষ এই স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—এদেশের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংলার মেয়েলি আচার রম্ভাতৃতীয়া ব্রত, ষোলকলা ব্রত ইত্যাদির ভিতর দিয়া তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার সামাজিকজীবনে ইহার এই বিশেষমূল্য হইতেই ইহা নবপত্রিকার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা (utillty)-এর ভিত্তিতেই আদিম সমাজে দেবপরিকল্পনা উদ্ভূত হইত, বাঙ্গালীর ব্যবহারিক জীবনে কদলী বৃক্ষের যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, তাহা হইতেই ইহা লৌকিক ধর্মাচরণের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

নবপত্রিকার অন্যতম উদ্ভিদ্ কচুগাছকেও দুর্গাপূজার প্রারম্ভেই কালিকা বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বতন্ত্র মন্ত্র দ্বারা আবাহন করা হয়। তাহার আবাহন মন্ত্রের বাংলা অনুবাদ এই, 'কালিকে তোমাকে প্রণাম, তুমি কচু গাছে অধিষ্ঠান কর, তুমি পুণ্যব্রতকারিণী, মহিষাসুরের সঙ্গে সংগ্রামে তুমি কচুগাছে পরিণত হইয়াছ। তুমি হরপ্রিয়া, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এইখানে আবির্ভূত হও।'

কৃষিভিত্তিক এদেশের সমাজ এদেশের নিতান্ত পরিচিত স্বল্পায়ু ওষধি-জাতীয়

বৃক্ষের মধ্যেও দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছে। কচুগাছের মত ক্ষুদ্র অবজ্ঞাত একটি উদ্ভিদের মধ্যেও যে কালিকাদেবীর বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারিণী শক্তি বিধৃত, তাহারা তাহা অনায়াসে কল্পনা করিয়াছে। কচুগাছ, ইহার মূল ও ইহার শিকড় বর্ষার দুর্দিনে দরিদ্রের জীবনরক্ষার সহায়, ইহার উপাসনার ভিতর দিয়া ইহার প্রতি সমাজের কৃতজ্ঞ মনোভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

নবপত্রিকার অন্যতম উদ্ভিদ্ হরিদ্রা। ইহাও বাঙালীর আচার-জীবনের বহু দিক স্পর্শ করিয়া আছে ; বিবাহ গায়ে-হলুদ আজও এ জাতি পালন করিয়া থাকে। খাদ্যে, ঔষধে ও প্রসাধনে ইহা এ জাতির জীবনে অপরিহার্য ছিল। বাংলার প্রান্তবর্তী প্রদেশ উড়িষ্যার কন্দ্ নামক এক উপজাতি হরিদ্রা চাষের উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে জঘন্যতম উপাযে একদিন নরহত্যা করিয়া ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রসন্ন করিত। এই সকল সূত্র হইতেই বাংলার দুর্গাপূজার নবপত্রিকায় হরিদ্রা গাছ স্থান লাভ করিয়াছে। এমন কি, এ জন্য এ কথাও মনে হইতে পারে যে, কন্দ্ জাতির সেই নরবলিই আজ দুর্গারূপিণী নবপত্রিকার সম্মুখে মহিষ বলির রূপ লাভ করিয়াছে। ধরিত্রীর উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নরবলি দিবার প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যেই একদিন প্রচলিত ছিল, ভারতের পূর্বাঞ্চলের অনেক ক্ষেত্রেই এই নরবলি আজ মহিষবলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। উড়িষ্যার হরিদ্রাবিলাসী কন্দ্ উপজাতির মধ্যেও এই উপলক্ষে নরবলি দিবার পরিবর্তে এখন মহিষ বলিই প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু নরবলির যে আনুষঙ্গিক আচারগুলি পালন করা হইত, মহিষ বলির মধ্যেও তাহা প্রায় আনুপূর্বিক রক্ষা করা হইয়াছে। বাংলা দেশে দুর্গা প্রতিমার সম্মুখে এখনও যে কোন কোন অঞ্চলে মহিষ বলি দিবার প্রথা পালন করা হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কোন কোন বিষয়ে ইহার মধ্যে উক্ত কন্দ্ জাতির মহিষবলির উপকরণের অস্তিত্ব আছে। বলি বৈদিক আচার নহে—বৈদিক আচার যজ্ঞ। প্রাগ্‌বৈদিক আর্যেতর সমাজের প্রভাব বশতঃ পরবর্তী হিন্দুসমাজে বলির প্রথা গৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, কৃষিভিত্তিক সমাজ হইতেই বলির উদ্ভব হইয়াছে, প্রাণী বধ করিয়া তাহার সদ্য রক্ত দ্বারা কৃষিভূমি সিক্ত করিতে পারিলে কৃষিভূমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়, এই বিশ্বাস হইতেই কৃষিজীবী আদিম সমাজ নরবলি

প্রবর্তন করে ; কারণ, নরই প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। হরিদ্রার রঙকে গাঢ় করিবার উদ্দেশ্যে কন্দ জাতি একদিন নরবলি দিত ; এই প্রকার কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর উপাসিত নবপত্রিকার মধ্যেও হরিদ্রার গাছ স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নবপত্রিকার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হরিদ্রা গাছকে এই ভাবে আবাহন করা হয় : 'হে হরিদ্রে, তুমি হরিদ্বর্ণ এবং উমারূপিণী, তুমি পবিত্র ব্রতকারিণী, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার পূজা গ্রহণ কর। আমার জীবনের দুর্গতি দূর কর।' দেখা যাইতেছে, এখানেও হরিদ্রা গাছ ও দুর্গাদেবীতে কোন পার্থক্যই কল্পনা করা হয় নাই, উভয়ই অভিন্ন।

এই ভাবে যব গাছকে কার্তিকী (অর্থাৎ কার্তিক মাসে যাহা জন্মায়) বলিয়া সম্বোধন করা হয়—হে কার্তিকী, শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যসংহারকারিণি, সর্বদেবতাগণ সহ আমি তোমাকে প্রণাম করি ! প্রসন্ন হইয়া তুমি আমাদিগকে বরদান কর।' বিল্ব বৃক্ষকে এই বলিয়া আবাহন করা হয়,— হে বিল্ববৃক্ষরূপিণী দেবি, তুমি শিব এবং বাসুদেব উভয়েরই প্রিয়, তুমি উমারও প্রিয়কারিণী, তোমাকে প্রণাম করি।' দড়িম্ব বৃক্ষকে রক্তদন্ত বলিয়া সম্বোধন করা হয় এবং এই বলিয়া আবাহন করা হয়,—হে সুদর্শনে, রক্তবীজের সঙ্গে সংগ্রামকালে তুমি চামুণ্ডারূপ ধারণ করিয়া তাহাকে সংহার করিযাছিলে, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদাত্রী হও।' অশোক বৃক্ষকে শোকদুঃখরহিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া এই ভাবে আবাহন করা হয,—'হে অশোকতরো, শোক কাহাকে বলে, তাহা তুমি জান না : তুমি শোকের ধ্বংসকারিণী, তুমি হরপ্রিয়া, তুমি দুর্গার আনন্দদাত্রী, তুমি আমাকেও তোমার মত শক্তি দাও।' মান (কচু) গাছকে চামুণ্ডা বলিয়া সম্বোধন করা হয় এবং তাহাকেও এই বলিয়া আবাহন করা হয়, —'হে মান, দেবী তোমার পত্রমধ্যে বাস করিয়া থাকেন, তুমি শচীর প্রিয়-কারিণী, আমার পূজা গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি বরদাত্রী হও।' বিজয়া দশমীর দিন প্রতি বাঙ্গালীর গৃহাঙ্গিনায় মানকচু গাছের নীচে দেবীর বিদাযের আসন পাতা হয়। জনশ্রুতি এই, পতিগৃহে ফিরিয়া যাইবার পথে দুর্গা কয়েক দিন মানকচু গাছে লুকাইয়া থাকেন। কারণ, পিতৃগৃহে আসিয়া তিনি যে রণ-রঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কাপড় ফেলিয়া দিয়া এক পা সিংহের পিঠে

ও আর এক পা মহিষাসুরের কাঁধে তুলিয়া দিয়া দশ হস্তে অস্ত্র লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইজন্য প্রথমেই স্বামীর গৃহে গিয়া উঠিতে লজ্জা বোধ করেন, অতএব তিনি তিন দিন মানকচুর পাতায় লুকাইয়া থাকেন। মানকচু গাছ যত তুচ্ছই হউক, দেবী তাহাতে অধিষ্ঠিত হ'ন, এই কথা বলিয়া ইহার মর্যাদা যে শতগুণ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

তারপর ধান গাছকে লক্ষ্মী বলিয়া সম্বোধন করিয়া এই ভাবে আবাহন করা হয়,—'হে ধান্য, তুমি জগতের জীবন দান করিবার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক স্বষ্ট হইয়াছ। তুমি উমার প্রিয়কারিণী, দিবারাত্র তুমি আমাকে রক্ষা কর।' সর্বশেষে উক্ত নয় জাতীয় বৃক্ষ ও শস্যকে একসঙ্গে দুর্গা বলিয়া সম্বোধন করিয়া এই ভাবে আবাহন করা হয়,—'হে নবপত্রিকে, তুমি নবদুর্গা, তুমি মহাদেবের প্রিয়। আমার পূজার সকল উপকরণ গ্রহণ করিয়া আমাকে রক্ষা কর, তুমি দেবতাদিগেরও রক্ষাকারিণী।'

এইভাবে আবাহন করিবার পর উক্ত নয় জাতীয় বৃক্ষ ও ফলগুলি অপরাজিতার লতা দ্বারা একত্র বন্ধন করা হয়। কলাগাছটিই ইহাদের মধ্যে আকারে বৃহত্তম থাকে বলিয়া ইহা একটি কলাগাছেরই আকার লাভ করে। তারপর ইহাতে একটি লালপেড়ে শাড়ী জড়াইয়া গণেশের প্রতিমার পার্শ্বে মাটির উপর দাঁড় করিয়া রাখা হয়, লাল শাড়ী জড়ানো সেই কলাগাছটি দেখিতে একটি অবগুণ্ঠনবতী নববধূ বলিয়া মনে হয়, সেইজন্যই ইহাকে কলাবৌ বলে। উপরে ইহার যে বর্ণনা দেওয়া হইল, তাহা হইতেই স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহা কৃষিভিত্তিক সমাজের শস্যোপাসনার পরিচায়ক, বাঙ্গালীর দুর্গাপূজার ইহাই আদি রূপ।

'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'র বর্ণনা হইতেও দেখা যায়, দুর্গা ধরিত্রীরই প্রতীক; তিনি শাকসব্জী দ্বারা নিজেকে ভরিয়া রাখেন, সেইজন্যই তিনি শাকম্ভরী। তাঁহার দশদিক পৌরাণিক যুগে আসিয়া দশ বাহুতে পরিণত হইয়াছে। ধরিত্রীকে শস্যভারে পূর্ণ করিবার বাধা অনাবৃষ্টি, মহিষাসুর এই অনাবৃষ্টির প্রতীক্। দুর্গাপূজার একটি প্রধান আচার দেবীর আনুষ্ঠানিক স্নান, ইহাকে মহাস্নান বলে, মহাস্নানের জল পূজার পরম প্রসাদ। এই মহাস্নান ধরিত্রীরই স্নান। সূর্য কিংবা ধরিত্রীর প্রতীক্‌কে স্নান করাইলে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দূর

হইবে, ইহা সমাজের এক অতি আদিম বিশ্বাস। ইংরেজীতে ইহাকে sympathetic magic বলে। বাংলার ধর্মঠাকুরের পূজায় সূর্য দেবতার প্রতীকের আনুষ্ঠানিক স্নানের পরিচয় পাই, দুর্গাপূজায় পৃথিবীর প্রতীককেও এই ভাবে স্নান করাইবার ব্যবস্থা করা হয়। বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা পরবর্তী কালে সামন্ত রাজাদিগের হাতে যে রূপই লাভ করুক, মূলতঃ ইহা যে আদিম সমাজের সংস্কার হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় ইহার মধ্যে এইভাবে এখনও রক্ষা পাইয়াছে।

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি কৃষিভিত্তিক। কৃষির আশ্রয় ধরিত্রী; সেইজন্য ধরিত্রীকে নানাভাবে প্রসন্ন করিবার যে বিচিত্র প্রয়াস যুগে যুগে এই জাতির দেখা যায়, তাহার উপরই বাঙ্গালীর সমাজ জীবনের সংগঠন ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ হইয়াছিল। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এই রহস্যটির সন্ধান না জানিলে বাঙ্গালী সম্পর্কে কোন ধারণাই নির্ভুল হইতে পারে না।